মাসিক
আল-আবরার
The Monthly AL-ABRAR
রেজি: নং- ১৪৫ বর্ষ-৩, সংখ্যা-০১

الأبرار
مجلة شهرية دعوية فكرية ثقافية اسلامية

ফেব্রুয়ারী ২০১৪ইং, রবিউছ ছানী ১৪৩৫হি:, মাঘ ১৪২০বাং
ربيع الثانى ١٤٣٥ فبراير ٢٠١٤م

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক
ফক্বীহুল মিল্লাত মুফতী আবদুর রহমান (দামাত বারাকাতুহুম)
প্রধান সম্পাদক
মুফতী আরশাদ রহমানী
সম্পাদক
মুফতী কিফায়াতুল্লাহ শফিক
নির্বাহী সম্পাদক
মাওলানা রিজওয়ান রফীক জমীরাবাদী
সহকারী সম্পাদক
মাওলানা মুহাম্মদ আনোয়ার হোসাইন
বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি
মুহাম্মদ হাশেম
সার্কুলেশন ম্যানেজার
হাফেজ আখতার হোসাইন

সম্পাদনা বিষয়ক উপদেষ্টা
মুফতী জামাল উদ্দীন
মুফতী এনামুল হক্ব কাসেমী
মুফতী মাহমূদুল হক্ব
মুফতী মুহাম্মদ সুহাইল
মুফতী আব্দুস সালাম
মাওলানা হারুন
মুফতী রফীকুল ইসলাম আল-মাদানী
মুফতী জা'ফর আলম কাসেমী

বিনিময়: ২০ (বিশ) টাকা মাত্র
প্রচার সংখ্যা : ১০,০০০ (দশ হাজার)

যোগাযোগ

সম্পাদনা দফতর
মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ
ব্লক-ডি, ফক্বীহুল মিল্লাত সরণি, বসুন্ধরা আ/এ, ঢাকা।
ফোন: ০২৮৪০২০৯১,০২৮৮৪৫১৩৮
ইমেইল :monthlyalabrar@gmail.com
ওয়েব : www.monthlyalabrar.com
www.monthlyalabrar.wordpress.com

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ২
পবিত্র কালামুল্লাহ থেকে :..... ৩
পবিত্র সুন্নাহ থেকে : ৪
হযরত হারদূয়ী (রহ.)-এর অমূল্য বাণী ৫
মাওয়ায়েযে ফক্বীহুল মিল্লাত : ইসলামী বিয়ে-১২... ৬
"সিরাতে মুস্তাকীম" বা সরলপথ: বিভ্রান্তি ও নিরসন-৬
কাযা নামায পড়ার বিধান..... ৮
মাওলানা মুফতী মনসূরুল হক
মুদ্রার তাত্ত্বিক পর্যালোচনা ও শরয়ী বিধান-১..... ১০
মাওলানা আনোয়ার হোসাইন
রাসূল (সা.)-এর সুন্নাত তরিকায় নামায পড়ি..... ১৬
মুফতী রফিকুল ইসলাম আল-মাদানী
তুরাগ তীরে বিশ্ববাসীর ইজতিমা..... ২০
মুফতী শরীফুল আজম
তাসাওফ বনাম প্রাচ্যবিদদের ষড়যন্ত্র..... ২৩
মুফতী শাহেদ রহমানী
মারকাযে সালানা ইসলাহী ইজতিমা :
ব্যতিক্রমধর্মী এক নূরানী আয়োজন ২৮
হাফেজ রিদওয়ানুল কাদির উখিয়াভী
নারী নির্যাতন রোধে ইসলাম ৩৫
মুফতি মুহাম্মাদ শোয়াইব
জিজ্ঞাসা ও শরয়ী সমাধান ৩৮
ইসলামে মানবাধিকার-১..... ৪৪
মাওলানা রিজওয়ান রফীক জমীরাবাদী

মোবাইল: প্রধান সম্পাদক: ০১৮১৯৪৬৯৬৬৭, সম্পাদক:০১৮১৭০০৯৩৮৩, নির্বাহী সম্পাদক: ০১১৯১২৭০১৪০ সহকারী সম্পাদক: ০১৮৫৫৩৪৩৪৯৯
বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি: ০১৭১১৮০৩৪০৯, সার্কুলেশন ম্যানেজার : ০১১৯১৯১১২২৪

সম্পাদকীয়

তা'লীম-তাযকিয়া-দাওয়াত

{০১}

দুনিয়া ব্যাপী ইসলাম ও শান্তি প্রতিষ্ঠার মৌলিক, সার্বজনীন এবং সার্বক্ষনিক কর্মসূচি তিনটি। তা'লীম, তাযকিয়া, দাওয়াত। সঠিকভাবে মুসলমানদের মাঝে এই তিনটি কাজ জারি থাকলে ইসলামের ক্রম বিকাশ অব্যাহত থাকবে। যারা এই কাজের সাথে জড়িত থাকবে তাদেরও দুনিয়া আখেরাতে সফলতা ও কামিয়াবীর ঘোষণা রয়েছে।

বিশ্ববিখ্যাত দারুল উলূম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠিত হয় এই তিনটি কর্মসূচির ভিত্তিতে। তারই আদলে দুনিয়া ব্যাপী সফলভাবে এই তিনটি কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে যাচ্ছেন উলামায়ে দেওবন্দ। তালীমী কর্মসূচী পালনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অসংখ্য দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। তাযকিয়ার কর্মসূচী পালনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অগণিত খানেকাহ। দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ বাস্তবায়নের জন্য দুনিয়া ব্যাপী তাবলীগী জামা'আতের মেহনত। এই তিনটির সমন্বিত প্রতিষ্ঠান অসংখ্য কওমী মাদরাসা। এসবের মাধ্যমে সঠিক ইসলাম চর্চিত হচ্ছে সারা দুনিয়ায়। এমনকি এর মাধ্যমে অমুসলিমরাও ইসলামের সঠিক আদর্শ অবলোকনে ইসলামের প্রতি ধাবিত হচ্ছে অহরহ। পাচ্ছে শান্তি ও সফলতার অমোঘ জীবন যাপনের নীতি আদর্শ।

পরিতাপের বিষয়, উলামায়ে দেওবন্দের এই তিন মিশনের বিরুদ্ধেই বিভিন্নরূপে করা হয় ভয়াবহ ষড়যন্ত্র। তাদের এসব মিশনে শুধু ছিদ্রান্বেষনেই তৎপর রয়েছে ইসলাম বিদ্বেষীদের হাতে গড়া বিভিন্ন দল উপদল। বিধর্মীদের শিখিয়ে দেওয়া মৌলবাদী, জঙ্গিবাদী, কট্টরপন্থী ইত্যাদির স্লোগানতো আছেই স্বয়ং ইসলামের আলখেল্লা পরে দেশে বিদেশে উলামায়ে দেওবন্দের নামে বিভিন্ন বিষোদগার আর অপবাদ রটনায় ব্যস্ত দেখা যায় অনেক নামধারী ইসলামী দলকেও। নাস্তিকদের মত তারাও শুধু অভিযোগই করে যান, এক অভিযোগকে দিনের পর দিন বারবার বিভিন্ন মিডিয়ায় প্রচার করতে দেখা যায়।

তাদের অন্তরে যদি ইসলামের সঠিক দরদ থাকে, তারা যদি সত্যিকার অর্থে ইসলাম প্রচারক হয়ে থাকেন কিংবা তারা যদি সত্যিকারের মুসলমানই হয়ে থাকেন তবে অভিযোগগুলো নিয়ে উলামায়ে কেরামের সাথে বসতে পারেন, কথা বলতে পারেন, প্রয়োজনে বাহাসও করতে পারেন। তাতে তো বিষয়গুলোর সহজ নিস্পত্তি হয়ে যায়। ছোট খাট বিষয়ে তিলকে তাল বানিয়ে একপক্ষীয়ভাবে নানা অপপ্রচারের অর্থই বা কি হতে পারে? তাতে প্রমাণিত হয় তারাই ইসলাম রক্ষার নামে ফিৎনা সৃষ্টিকারী হিসেবে আবির্ভূত। মুসলমানদের মাঝে কলহ বিবাদ ও ফিৎনা সৃষ্টিই তাদের মুখ্য এবং একমাত্র উদ্দেশ্য।

উলামায়ে দেওবন্দের এই মিশনগুলোতে পরিচালিত কোনো কাজই কুরআন সুন্নাহর বাইরে নেই। সবই কুরআন সুন্নাহ মতে স্বীকৃত বিষয়। যারা ইসলাম প্রতিষ্ঠার মেহনতে সারা জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছেন দ্বীনি খিদমতে, তাদের ব্যাপারেই বলা হচ্ছে এই কাজ হাদীসে নেই, ওই কাজ বিদআত ইত্যাদি। যারা ইসলামের পাহারাদার, সর্বপ্রকার ভেজাল মুক্ত ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়ন যাদের অহর্নিষ মিশন, যাদের লালন, বেড়া উঠা, শৈশব, কৈশোর, যৌবন প্রৌঢ় তথা সারা জীবন কুরআন হাদীস গবেষণায় ব্যয়িত তাদের বিরুদ্ধেই এসব প্রোপাগাণ্ডা। তাতে একথা বোঝার আর বাকী থাকেনা যে, ইসলামের ক্রম বিকাশমান এ ধারাবাহিকতাকে স্তব্ধ করে দেওয়াই ইসলামের মুখোশধারীদের এহেন রকমারি আয়োজন। সম্প্রতি তাদের মুখোশ উন্মোচিত হচ্ছে এবং হতে বাধ্য।

দুনিয়ায় ইসলামের সঠিক শিক্ষা, দাওয়াত এবং তাযকিয়ায়ে নাফসের কাজ কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে। কারণ এসব স্বয়ং নবী (সা.) এর কাজ, সাহাবায়ে কেরামের কাজ। তাদের বাস্তব আদর্শ ও নীতির উপর থেকে উলামায়ে দেওবন্দ তা বাস্তবায়ন করে আসছে শত শত বছর ধরে।

আমাদের সেই ভাইদের জন্যই চিন্তা হয়, যারা ওসব বাতিল শক্তির ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে নিজেকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিচ্ছেন, নিজের উভয় জিন্দেগীকে বরবাদ করছেন। তাদের প্রতি আমাদের আহ্বান থাকবে, পার্থিব যথসামান্য লবন-পানির জন্য দ্বীনকে বিক্রি করে না দিয়ে সঠিক হেদায়াতের জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করুন। আল্লাহ ও রাসূলের (সা.) সঠিক পথে আসুন। সাহাবায়ে কেরামের পথে আসুন। সলফে সালেহীনের পথে আসুন। আল্লাহ আমাদের সকলকে সঠিক সমজ দান করুন। আমীন।

{০২}

চলতি সংখ্যাটির মাধ্যমে মাসিক আল-আবরার প্রকাশনা ও প্রচারণার দুই বর্ষ অতিক্রম করে তৃতীয় বর্ষে উপনীত হলো। তা সম্ভব হয়েছে একমাত্র আল্লাহর অপার রহমত ও কৃপায়। পাঠক, গ্রাহক, এজেন্ট এবং শুভানুধ্যায়ীদের দু'আ, আন্তরিকতা এবং আগ্রহ এর যাত্রাপথকে বেগবান করেছে। এর জন্য আমরা আল্লাহর শোকর আদায় করছি এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি সকলের প্রতি।

পাঠকগণ নিশ্চয় অবগত আছেন, মাসিক আল-আবরারের দুই বছরের নির্বাচিত কলামগুলো একত্রিত করে **"তুহফাতুল আবরার"** নামে একটি পুস্তক প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। পূর্ণোদ্দামে এর কাজ চলছে। আশা করা যায়, অতি সম্প্রতি পুস্তকটি পাঠকদের হাতে তুলে দেওয়া যাবে। ইনশাআল্লাহ।

মাসিক আল-আবরারের দুই বছর পূর্তিতে যাদের যেভাবে সহযোগিতা রয়েছে আমরা সকলকে ধন্যবাদ জানাই এবং দু'আ করি। মাসিক আল-আবরার যেন ব্যাপকভাবে হেদায়াতের উসীলা হয় এবং এই মিশন যেন স্থায়ী হয় এই দু'আ কামনা...।

আরশাদ রহমানী
৩১/০১/২০১৪

পবিত্র কালামুল্লাহ শরীফ থেকে

উচ্চতর তাফসীর গবেষণা বিভাগ :
মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ

প্রকৃত পীর আওলিয়া ও দ্বীনের মেহনতকারীদের প্রতি ভালবাসা কেন জন্ম হয়?

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا (سوره مريم ٩٦)

"যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে দয়াময় তাদের জন্য সৃষ্টি করবেন ভালবাসা। (মরিয়াম ৯৬)

এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা স্পষ্ট বলেছেন যে, যারা একত্মবাদে বিশ্বাসী এবং যাদের আমলে সুন্নাতের নূর রয়েছে তিনি তাঁর বান্দাদের অন্তরে তাঁদের মুহাব্বত সৃষ্টি করে দেন। যেমন হাদীস শরীফে আছে– হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ যখন কোনো বান্দাকে মুহাব্বত করেন তখন হযরত জিবরাইল (আ.)কে ডেকে বলেন, আমি অমুক বান্দাকে মুহাব্বত করি, সুতরাং তুমিও তাকে মুহাব্বত করো। তখন জিবরাঈল (আ.)ও তাকে মুহাব্বত করেন। তারপর জিবরাঈল (রা.) আকাশে ঘোষণা দিয়ে বলেন, "আল্লাহ অমুক বান্দাকে মুহাব্বত করেন, সুতরাং তোমরাও তাকে মুহাব্বত করো।" তখন সমস্ত আকাশবাসী তাকে মুহাব্বত করে। তারপর দুনিয়াবাসীর অন্তরে তার কবুলিয়্যাত রেখে দেওয়া হয়। আর তিনি যখন কোনো বান্দাকে দুশমন হিসেবে জানেন তখন জিবরাঈল (আ.)কে ডেকে বলেন, "আমি অমুক বান্দাকে ঘৃণা করেছি, সুতরাং তুমিও তাকে ঘৃণা করো।" তখন জিবরাঈল (আ.) তাকে শত্রু ভাবেন এবং আকাশবাসীর নিকট এই ঘোষণা করেন যে, আল্লাহ অমুক বান্দাকে দুশমন ভেবেছেন, সুতরাং তোমরাও তাকে দুশমন মনে করো।" তখন সবাই তাকে দুশমন মনে করে। তারপর পৃথিবীতে তার শত্রুভাব মানুষের অন্তরে সৃষ্টি করে দেয়া হয়।

হযরত সাওবান (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সা.) বলেছেন, যে বান্দা মহামহিমান্বিত আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে এবং তাঁর সন্তোষের কাজে নিমগ্ন থাকে, তখন মহান আল্লাহ হযরত জিবরাঈল (আ.)কে ডেকে বলেন, আমার অমুক বান্দা আমাকে সন্তুষ্ট করতে চায়। জেনে রেখো, আমি তার প্রতি সন্তুষ্ট আছি। তার উপর আমি আমার রহমত নাযিল করতে শুরু করেছি।" তখন হযরত জিবরাঈল (আ.) ঘোষণা করেন, অমুকের উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হয়েছে। তারপর আরশ বহনকারী ফেরেশতারাও ঘোষণা করেন। এরপর পার্শ্ববর্তী ফেরেশতাগণও ঘোষণা করে দেন। মোট কথা সপ্ত আকাশে এই শব্দগুঞ্জিত হয়। তারপর যমীনে তার কবুলিয়্যাত রেখে দেওয়া হয়।" এ ধরনের আরও কয়েকটি হাদীস মুসনাদে আহমদে রয়েছে। যাতে এও আছে যে, প্রেম ও প্রসিদ্ধি কারো নিকৃষ্টতা ও উৎকৃষ্টতার সাথে নয়, এটা আকাশ থেকে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে অবতীর্ণ হয়। মুসানাদে আবি হাতিমে এই প্রকারের হাদীসের পরে রাসূলুল্লাহ (সা.) কুরআন কারীমের এই আয়াতটি পড়াও বর্ণিত আছে। সুতরাং এই আয়াতের ভাবার্থ হলো এই যে, ভাল আমলকারী ঈমানদারের সাথে আল্লাহ তা'আলা মুহাব্বত করে থাকেন এবং যমীনের উপরেও তার মুহাব্বত ও কবুলিয়্যাত অবতীর্ণ হতে থাকে। মুমিন তাকে ভালবাসতে থাকে। তার ভাল আলোচনা হয় এবং তার মৃত্যুর পরেও তার উত্তম খ্যাতি অবশিষ্ট থেকে যায়।

হারাম ইবনু হিব্বান (রা.) বলেন, যে বান্দা সত্য ও আন্তরিকতার সাথে আল্লাহর দিকে ঝুঁকে পড়ে, আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের অন্তরকে তার দিকে ঝুঁকিয়ে দেন এবং তারা তাকে ভালবাসতে শুরু করে।

হযরত উসমান ইবনু আফফান (রা.) বলেন, বান্দা যে ভাল মন্দ কাজ করে, আল্লাহ তাকে তারই ওই চাদর দ্বারা ঢেকে দেন।

হযরত হাসান বসরী (রহ.) বলেন, একটি লোক ইচ্ছা করে যে, সে আল্লাহর ইবাদত এমনভাবে করবে যেন জনগণের মধ্যে তার সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। অতঃপর সে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত শুরু করে দেয়। দেখা যায়, সে মসজিদে সবারই আগে যায় এবং সবারই পরে বেরিয়ে আসে। এভাবে সাত মাস কেটে যায়। কিন্তু সে শুনতে পায় যে, লোকেরা তাকে রিয়াকার (লোক দেখানো ইবাদতকারী) বলছে। এই অবস্থা দেখে সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে যে, সে শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই আমল করবে। অতঃপর সে আন্তরিকতার সাথে আমল শুরু করে দেয়। ফলে অল্প দিনের মধ্যেই সমস্ত লোক বলতে শুরু করে অমুক ব্যক্তির উপর আল্লাহ তা'আলা রহম করুন। এভাবে সে প্রকৃত দ্বীনদার ও আল্লাহ ভক্ত হয়ে যায়।

তাফসীরে ইবনে জরীরে রয়েছে, এই আয়াতটি হযরত আব্দুর রহমান ইবনু আউফের (রা.) ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে।

(তাফসীরে ইবনে কাসীর অবলম্বনে)

পবিত্র সুন্নাহ থেকে

উচ্চতর হাদীস গবেষণা বিভাগ : মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ

মানুষের প্রতি সম্মানবোধ

একজন মানুষ আরেকজন মানুষকে সম্মান করতে পারলে বা তাকে সঠিক মূল্যায়ন করতে পারলে তাদের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ বাড়ে। তখন তা মানুষের পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে শান্তি প্রতিষ্ঠায় ব্যাপক ভুমিকা রাখে। ব্যক্তিগত ও সমষ্টিক জীবন আনন্দময় হয়ে উঠে। আর যদি পারস্পরিক সম্মানবোধ না থাকে তাহলে অন্য জনের প্রতি অবজ্ঞা অবহেলা অবমূল্যায়ন মানুষের জীবনে স্থান করে নেয়। যার ফল হিসেবে মানুষের জীবনে নেমে আসে ধারাবাহিক অশান্তি। যা গড়িয়ে যায় কাল থেকে কালান্তর।

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন: لَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا تَنَافَسُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا 'তোমরা পরস্পরে বিদ্বেষপরায়ণ হয়ো না, একে অন্যের পেছনে লেগো না এবং পরস্পরে প্রতিহিংসায় লিপ্ত হয়ো না, বরং একে অন্যের সাথে ভাই-ভাই ও এক আল্লাহর বান্দা হয়ে যাও।" হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

যে ব্যক্তি কোনো মুমিনের পার্থিব কষ্টসমূহ থেকে কোনো একটি কষ্ট দূর করবে কিয়ামতের কষ্টসমূহ থেকে আল্লাহ তার একটি কষ্ট দূর করবেন। যে ব্যক্তি কোনো মুমিনের দোষ গোপন রাখবে, আল্লাহ তা'আলা দুনিয়া ও আখিরাতে তার দোষ গোপন রাখবেন। যে ব্যক্তি কোন অভাবীকে দুনিয়াতে ছাড় দেবে আল্লাহ তাআলা তাকে দুনিয়া ও আখিরাতে ছাড় দেবেন। আর আল্লাহ তাআলা বান্দার সাহায্য করেন যতক্ষণ সে তার ভাইয়ের সাহায্য করে' (মুসনাদে আহমদ)।

কিন্তু দুঃখ জনক হলেও সত্য যে, আমরা আজ ইসলামের এই শিক্ষা থেকে অনেক দূরে সরে গিয়ে একে অন্যের ক্ষতি সাধনের পেছনে লেগে থাকি। কারো উন্নতি দেখলে তাকে হিংসা করি। নিজের একটু ক্ষতি হলেও যেখানে অন্যের উপকার করার কথা সেখানে আমরা নিজের ক্ষতি হয় না এমন বিষয়েও মানুষের উপকার করতে চাই না। একে অন্যকে যে কোনো ভাল কাজে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করি। রাজনৈতিক স্বার্থের সামনে তো মানুষের জীবনের কোনো মূল্য আছে বলেও মনে হয় না। সামান্য পার্থিব স্বার্থে কলহ, দ্বন্ধ এমনকি সংঘর্ষেও জড়িয়ে যেতে ভ্রুক্ষেপ করা হয় না। যা মুসলমানের শান নয়।

ইসলামের শিক্ষা হচ্ছে এক মুসলমান আরেক মুসলমানের ভাই। হাদিসে আছে, সকল মুমিন-মুসলমান মিলে একটি দেহের মতো, দেহের কোনো এক স্থানে আঘাত পেলে তা সারা দেহেই ছড়িয়ে পড়ে।"

আর আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (سورة الحجرات ١٠)

"মুমিনরা তো পরস্পর ভাই-ভাই। অতএব, তোমরা তোমাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে মীমাংসা করবে এবং আল্লাহকে ভয় করবে-যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হও।

বিশিষ্ট আলেমেদ্বীন মাও. ইয়ার মুহাম্মদ সাহেবের ইন্তিকালে

ফক্বীহুল মিল্লাত মুফতী আব্দুর রহমান (দা.বা.) তিনি ইলমে নববীর ময়দানে একজন অজেয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন

চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি থানাধীন আমতলী আজিজিয়া মাদরাসার শায়খুল হাদীস, বিশিষ্ট আলেমেদ্বীন হযরত মাওলানা ইয়ার মুহাম্মদ সাহেব (রহ.) এর ইন্তিকালে গভীর শোক ও তার পরিবারের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করতে গিয়ে "ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার বসুন্ধরা ঢাকার" প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, বাংলাদেশের সর্বজন শ্রদ্ধেয় ইসলামী ব্যক্তিত্ব বিশিষ্ট আইন ও হাদীস বিশারদ হযরতুল আল্লামা ফক্বীহুল মিল্লাত মুফতী আব্দুর রহমান এক বাণীতে বলেন, তিনি আলেম কুলের মধ্যে একজন আদর্শ ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তাঁর ইলমী দক্ষতা বহু উঁচু ছিল। তিনি ইলমে নববীর বাগানে একজন অজেয় ব্যক্তিত্ব হিসেবেই ভাস্বর থাকবেন।

হযরত ফক্বীহুল মিল্লাত (দা.বা.) তাঁর ইন্তিকালের খবর পেয়ে আপন পরিচালনাধীন মাদরাসাসমূহসহ বিভিন্ন মাদরাসায় দু'আ ও খতমে কুরআনের ব্যবস্থা করার নির্দেশ দেন। তিনিও ইসলামিক রিসার্চ সেন্টারে ছাত্রদের নিয়ে খুব দু'আ করেন।

উল্লেখ্য, হযরত মাওলানা ইয়ার মুহাম্মদ সাহেব আনুমানিক ১৯২৬ সালে ফটিকছড়ি থানাধীন ধর্মপুরে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নিজ গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনের পর নাজিরহাট বড় মাদরাসা, মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী, জামিয়া ইসলামিয়া জিরিতে মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শিক্ষা অর্জন করেন। এরপর বিশ্ববিখ্যাত দারুল উলুম দেওবন্দ ইউপি, ভারত ও জামিয়াতুল উলূম আল-ইসলামিয়া আল্লামা ইউসুফ বিন্নুরী টাউন করাচী, পাকিস্তান থেকে পুনরায় স্নাতকোত্তর শিক্ষা গ্রহণ করেন। দেশে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি জামিয়া ইসলামিয়া জিরি পটিয়া, চট্টগ্রাম, জামিয়া কুরআনিয়া আরবিয়া লালবাগ, ঢাকাসহ চট্টগ্রামের বাবুনগর, নাজিরহাট ও নানুপুর ইত্যাদি মাদরাসায় সিনিয়র মুহাদ্দিস ও শায়খুল হাদীস হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি গত ৩০-০১-২০১৪ বৃহস্পতিবার ৮৭ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। (ইন্না লিল্লাহি...) জানাযা শেষে নিজ গ্রামে পারিবারিক কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

মুহিউস সুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক্ব হক্কী হারদূয়ী (রহ.)-এর

অমূল্য বাণী

আমাদের সন্তানগণ এই দায়িত্ব পালন করবে না কেন?

প্রিয় বন্ধুগণ! ফক্বীহ তথা ইলমে নববীতে পারদর্শী হোন। নিজের সন্তানদেরকেও বানান। দেখুন, দেশে ক্ষমতার পরিবর্তন হয়। এক সরকারের সময় শেষ হলে নতুন সরকার আসে। প্রধানমন্ত্রী, প্রেসিডেন্টসহ সরকারি সকল পদ পুনরায় পূর্ণ হয়ে যায়। শূন্য থাকে না। তেমনি নবুওয়াতের ধারা খতম হয়ে গেছে। কিন্তু বেলায়াতের দ্বার উন্মুক্ত রয়েছে। তাতেও বিভিন্ন স্তর রয়েছে। কুতুব, গাউস, আবদাল। এসব পদও কিয়ামত পর্যন্ত শূন্য যাবে না। আল্লাহর নির্বাচিত লোক এ সকল পদ অলংকৃত করবেন। এসব পদে যুগের শ্রেষ্ঠ উলামায়ে কেরাম, মুহাদ্দিস এবং ফকীহগণ অধিষ্ঠিত ছিলেন, আছেন এবং থাকবেন। যত দিন দ্বীন থাকবে তত দিন এসব পদে যোগ্য লোকেরাও অধিষ্ঠিত থাকবেন। এসব পদ পূরণ করার জন্য আল্লাহর বান্দাগণ তৈরি হবেন। বলুন ইমাম রাযী (রহ.)-এর স্থলাভিষিক্ত হবেন কি না? শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.)-এর স্থলাভিষিক্ত হবেন কি না? আকাবেরে দ্বীন হযরত কাসেম নানুতবী (রহ.), হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.), হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহ.) প্রমুখ দ্বীনের যে ব্যাপক খেদমাত আঞ্জাম দিয়েছেন এই ধারাবাহিকতা বাকি থাকবে কি না? পরে এরূপ লোক আসবেন কি না? স্পষ্ট কথা হলো, কোনো না কোনো লোককে আল্লাহ তা'আলা এসব পদে বসাবেন। কারণ দ্বীনের খেদমাত, দ্বীনের প্রচার-প্রসার কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে। কোনো না কোনো ব্যক্তি এ সকল খেদমাত আঞ্জাম দেবেন। সুতরাং আমাদের সন্তানদের এসব পদ অলংকৃত করার মতো যোগ্য করে তুলব না কেন? আমাদের সন্তানগণ এসব খেদমাত আঞ্জাম দেবে না কেন? চিন্তা করুন এসব বিষয়ে আমাদের কত গাফলতী হচ্ছে। এসব পদ অলংকৃত করার জন্য আমাদের সন্তানগণ যদি গড়ে না উঠে তবে কি অবস্থা হবে।

দ্বীনি ইলম অর্জনকারীদের মর্যাদা :

এই বিষয়ে আরেকটি কথা বলব। দুনিয়াতে যারা আওলিয়ায়ে কেরামের তরীকায় চলে, দ্বীনের সাথে লেগে থাকে তাদের দেখো। দুনিয়াতেই তাদের ইজ্জত সম্মান ও মর্যাদা কী? ঈদ, কুরবানীর ঈদের সময় যেখানে মুসল্লীদের জমায়েত হয় সেখানে দুনিয়ার বড় বড় লোকদের সমাগম হয়। সরকারি বড় বড় পদের লোকজনও সেখানে উপস্থিত হন। মন্ত্রী-এমপিরা আসেন। প্রেসিডেন্ট আসেন। এমন অবস্থাতে ইমাম কাকে বানানো হয়? সেখানে অর্থ-বিত্ত আর পদমর্যাদা বিবেচনায় কাউকে ইমাম বানানো হয় না। বরং সবার ইমামতী করেন হাফেজ, আলেম, কারী প্রমুখ। দেখুন দ্বীনি ইলম অর্জনকারীর মর্যাদা আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতেও দিয়ে দিচ্ছেন।

সন্তানের দ্বীনি শিক্ষার ব্যবস্থা করা :

প্রিয় বন্ধুগণ! আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের খাতিরে নিজ নিজ সন্তানকে আলেম বানান, দ্বীনি ইলমে পারদর্শী হিসেবে গড়ে তুলুন, নিজেও দ্বীনি ইলম অর্জন করুন, ফক্বীহ হোন। নিজের এবং নিজের পরিবার ও আত্মীয়স্বজনের সন্তানদের দ্বীনি ইলম অর্জনের ব্যবস্থা গ্রহণ করুন, এর জন্য চেষ্টা কুশিশ করুন। দ্বীনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, মক্তব, মাদরাসা, হিফজখানা ইত্যাদিতে নিয়মিত সন্তানদেরকে পড়ান, এদের নিয়ম ও উসূল মতে পরিচালিত হলে দ্বীনের খাদেম হিসেবে তৈরি হবে। এদের দ্বারা সুন্নাতের আলো বিস্তৃত হবে। এসব মাদরাসা দ্বীনের মারকায। এসব মাদরাসার দেখাশোনা করাও একটি দায়িত্ব। কোনো বাগান, তাতে সর্বপ্রকার গাছপালা আছে। কিন্তু তাতে কোনো সময় পানির ঘাটতি হলে গাছপালা শুকিয়ে যাবে সে কারণে তাতে পানির ব্যবস্থা করা আবশ্যক। সেরূপ মাদরাসা, মক্তবসমূহের দেখাশোনা করা, তাদের সাহায্য সহযোগিতা করা, হর্ষ-বিষাদে তাদের পাশে থাকা বড় সাআদত ও নেকীর কাজ। সেটা একাকীও করা যায়, সামষ্টিকভাবেও করা যায়। এসব দ্বীনি প্রতিষ্ঠানের মূল্যায়ন করা আবশ্যক। হাদীস শরীফে এই হুকুমই দেওয়া হয়েছে, দ্বীনি শিক্ষায় পারদর্শী তথা ফকীহ হও, অন্যকে ফক্বীহ বানানোর জন্য ব্যবস্থা করো, নিজের সন্তানদের দ্বীনি শিক্ষায় পারদর্শী বানানোর চেষ্টা করো। অপারগতাবশত সামষ্টিকভাবে হলেও এসব দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের খোঁজখবর নাও। যেখানে দ্বীনি প্রতিষ্ঠান নেই, সেখানে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করো। যেখানে পূর্ব থেকে আছে সেখানে তাদের সাহায্য করো। তখনই হাদীসের দাবি পূরণ হবে।

মাওয়ায়েযে

হযরত ফক্বীহুল মিল্লাত (দামাত বারাকাতুহুম)

বসুন্ধরা মারকায, চট্টগ্রামের শুলকবহর মাদরাসাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে হযরত ফক্বীহুল মিল্লাত (দামাত বারাকাতুহুম) আকদে নিকাহের অনুষ্ঠান এবং হাদীসের দরসে বিবাহের শরয়ী নীতিমালা, সুন্নত তরীকা, সমাজে প্রচলিত রুসুম সম্পর্কে বিস্তারিত বয়ান ও তাকরীর পেশ করেন। তাঁর তাকরীর ও বয়ানগুলোর আলোকে প্রমাণিক এই প্রবন্ধটি সাজানো হয়েছে।

ইসলামী বিয়ে-১২

অজুহাত :

উপযুক্ত বয়স হওয়ার পরও শরয়ী কোনো উযর/অপারগতা ছাড়া বিবাহ না করা বা পাশ কেটে যাওয়া মূলত পূতঃপবিত্র এই সুন্নতটিকে অবহেলার নামান্তর। শরীয়তের শিক্ষা ও দীক্ষা তো এই যে, উপযুক্ত হওয়ার সাথে সাথে কালক্ষেপণ না করে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যাওয়া। কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে অনুভূতিহীন এক শ্রেণীর অভিভাবক, আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে এক শ্রেণীর নানা-নানির বয়সের ছেলেমেয়েকে দেখা যায় বিবাহ-শাদীতে তারা বেজায় নাখোশ এবং অনাগ্রহী। এ ক্ষেত্রে তাদেরকে কিছু খোঁড়া অজুহাত ও বাহানা পেশ করতে দেখা যায়। নিম্নে কয়েকটি অজুহাত তুলে ধরা হলো।

এক. লেখাপড়া

অনেক যুবক-যুবতী এবং অভিভাবকগণ লেখাপড়ার ব্যস্ততাকে বিবাহের প্রতি অনীহার কারণ হিসেবে উল্লেখ করে থাকেন। অথচ এটা সরাসরি শরীয়তবিরোধী একটি মনোভাব এবং নববী শিক্ষার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন-

اذا خطب اليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ان لا تفعلوه تكن فتنة فى الارض وفساد عريض

"তোমাদের কাছে যদি এমন কোনো ব্যক্তি বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে আসে, যার দ্বীনদারী ও চারিত্রিক দিক সন্তোষজনক তাহলে তার নিকট তোমাদের অভিভাবকত্বে থাকা মেয়ের বিয়ে সম্পন্ন করে দাও। না করলে ফেতনা-ফাসাদ চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে। (তিরমিযী)

ফেতনা-ফাসাদ দ্বারা নর-নারীর বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ককে বোঝানো হয়েছে। অতএব যে শিক্ষা চরিত্র গঠনে নয়, হরণে ভূমিকা পালন করে তা কখনো কোনো মুসলিমের কাম্য হতে পারে না। অন্ধকার জগতে আলোর অন্বেষণ ম্যান্টালিজম ও সমর্থন করে না। প্রয়োজনীয় শিক্ষা সমাপ্ত করা ভালো কাজ। তবে এটাকে বাহানা বানিয়ে বিবাহ বিলম্ব করা সমর্থন যোগ্য নয়। বিশেষ করে যেখানে চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষা করা দুরূহ। নারীদের জন্য এতটুকু ধর্মীয় শিক্ষাই যথেষ্ট যতটুকু দ্বারা সে পবিত্রতা অর্জন এবং সহীহ শুদ্ধভাবে নামায-রোযা আদায় করতে পারে। অতঃপর যখন যা ফরজ হবে তা কোনো মাধ্যমে বিজ্ঞ আলেম থেকে জেনে নেওয়া আবশ্যক।

দুই. নিজের পায়ে দাঁড়ানো

অনেক যুবককে বলতে শোনা যায়। আগে নিজের পায়ে দাঁড়াব তারপর বিবাহ। আরে ভাই! ছোটবেলা থেকে এ পর্যন্ত তুমি আল্লাহর দেওয়া দুটি পায়ের ওপরই দাঁড়িয়ে আছ, অন্যের পায়ের ওপর নয়। যদি আর্থিক সচ্ছলতাই এই বাক্যের উদ্দেশ্য হয় তাহলে মনে রেখো, সহী নিয়তে বিয়ে করলে আল্লাহ তা'আলা তোমাকে আর্থিকভাবেও সচ্ছল করে দেবেন। এ ব্যাপারে কুরআনে ঘোষণাও করা হয়েছে-

وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم-

"অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে যারা অবিবাহিত (পুরুষ হোক বা নারী) তাদের বিবাহ সম্পাদন করো এবং গোলাম ও বাদীদের মধ্যে যারা বিবাহের উপযুক্ত তাদেরও। তারা অভাবগ্রস্ত হলে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাব মুক্ত করে দেবেন। আল্লাহ অতি প্রাচুর্যময় সর্বজ্ঞ। (সূরা নূর-৩২)

আয়াতে এ ব্যাপারে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, অবিবাহিত নর-নারীর ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সকলের উচিত তাদের বিবাহের জন্য চেষ্টা করা। এ ক্ষেত্রে তাদের বর্তমান সামর্থ্যই যথেষ্ট। বিবাহের পর স্ত্রী ও সন্তানদের ব্যয় ভার বহন করতে গিয়ে অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়তে পারে এই আশংকায় বিবাহ বিলম্বিত করা সমীচীন নয়। চরিত্র ও পবিত্রতা রক্ষার উদ্দেশ্যে আল্লাহর ওপর ভরসা করে বিবাহ করলে অতিরিক্ত ব্যয় নির্বাহের জন্য অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা কোনো সুব্যবস্থা করে দেবেন।

রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন-
ثلاثة حق على الله عونهم-- والناكح الذى يريد العفاف.
"তিন শ্রেণীল লোকের উপর আল্লাহর সাহায্য অবধারিত।" একজন হলো ওই ব্যক্তি যে নিজের পবিত্রতা রক্ষার্থে বিবাহ করে।" (তিরমিযী হা. ১৬৫৫, নাসাঈ-৩২১৮)

এ ছাড়া এমন অসংখ্য সাহাবার ঘটনা রয়েছে, যারা দরিদ্রতা ও অভাবের নিম্নস্তরে থেকেও বিবাহ করতে কালক্ষেপণ করেননি। যেমন হযরত আলী (রা.) রিক্ত হস্ত হওয়া সত্ত্বেও হযরত ফাতেমা (রা.)-কে বিবাহ করেন। অনুরূপ ওই সাহাবীর ঘটনাও প্রসিদ্ধ যিনি আরবের রেওয়াজ অনুযায়ী নববধূকে নগদ কিছু দেওয়ার মতো না পেয়ে এমনকি একটি লোহার আংটি না থাকা সত্ত্বেও বিবাহ করেন। (বুখারী-৫২৩৫, মুসলিম-১৪২৫)

উল্লিখিত আলোচনা দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, বিবাহ অভাব ও দরিদ্রতা বিমোচন করে। তবে এর জন্য ইখলাস ও সদিচ্ছা থাকা জরুরি। আরেকটি কথা মনে রাখতে হবে, কেউ বিবাহের কারণে অভাবী হয় না। স্বভাব বা অন্য কারণে হতে পারে। আর নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে পরে বিবাহের প্রবক্তাদের অনেককে দেখা যায় যৌতুকের হিসাব তারা লক্ষ ও নিযুতের সংখ্যা দিয়ে করে থাকে। তিক্ত হলেও এটাই সত্য।

তিন. ঝামেলা

অনেকে সুস্থতা ও সচ্ছলতা সত্ত্বেও বিবাহের প্রতি বিরাগভাজন হয়ে থাকে এটাকে বাড়তি ঝামেলা মনে করে। তাদের বক্তব্য হলো এত তাড়াতাড়ি সাংসারিক গ্যাড়াকলে আবদ্ধ হওয়া যাবে না। আরো কিছুকাল লাইফকে এনজয় করতে হবে! মনে রাখবেন, এটা নিরেট ইবলিশী চিন্তাধারা। তারা নয় বরং শয়তানই তাদের লাইফকে এনজয় করে। আরে ভাই! নিঃসঙ্গে এনজয় করার কী আছে? এনজয় করতে চাইলে বিবাহের বিকল্প নেই। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

"তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্য হতে একটি এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদেরই মধ্য হতে স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন। যাতে তোমরা তাদের কাছে গিয়ে শান্তি লাভ করো এবং তিনি তোমাদের পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয়ই এর মধ্যে নিদর্শন রয়েছে সেসব লোকের যারা চিন্তা-ভাবনা করে।" (সূরা রূম-২১)

এই আয়াত থেকে স্পষ্ট বুঝে আসে যে, সুখ-শান্তি, আনন্দ-ফুর্তি এবং উপভোগ/ এনজয় করার মতো জিনিস বিবাহের মধ্যেই রয়েছে। অবিবাহিতরা তো এর থেকে পরিপূর্ণ বঞ্চিত।

শরীয়তের বিরোধিতা :

বিয়ের আগে-পরে জেনে না জেনে এমন অনেক কাজ করা হয় যেগুলো শরীয়তবিরোধী ও মানবতাবিরোধীও। এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিষয় নিম্নে তুলে ধরা হলো।

এক. অপচয়

বর্তমানে বিবাহ-শাদীতে রসম রেওয়াজ পালন করার জন্য এত বেশি পরিমাণ অর্থ সম্পদ ব্যয় করা হয় যে, একজন প্রকৃত মুমিন তো দূরের কথা, কোনো সাধারণ বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তিও এটা সমর্থন করতে পারবে না। অথচ এই অর্থের দশ ভাগের এক ভাগ ও যদি নিজের আত্মীয়স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে যারা হতদরিদ্র এবং গরিব ও বিধবাদের জন্য ব্যয় করা হয় তাহলে তাদের অভাব দূর হবে, মুখে হাসি ফুটবে, দারিদ্র্য বিমোচন হবে, বন্ধন মজবুত হবে, জয় হবে মানবতার। আর তার জন্য আল্লাহর নৈকট্য অবধারিত। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ.

"যারা অপ্রয়োজনীয় কাজে অর্থ ওড়ায় তারা শয়তানের ভাই।" (বনী ইসরাঈল-২৭)

আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন-

وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا.

"আত্মীয়স্বজনকে তাদের হক আদায় কর এবং অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরকেও। আর নিজেদের অর্থ সম্পদ অপ্রয়োজনীয় কাজে উড়াবে না। (বনী ইসরাঈল-২৬)

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে-

وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

"তোমরা অপচয় করো না। আল্লাহ অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না।" (সূরা আরাফ-৩১)

কুরআন শরীফে উল্লিখিত تبذير (তাবযীর) এবং اسراف (ইসরাফ) শব্দ দ্বয়ের অর্থ অপব্যয় ও অপচয় করা হলেও উভয়ের মধ্যে বিস্তর ফারাক রয়েছে। বৈধ কাজে মাত্রাতিরিক্ত খরচ করাকে اسراف(ইসরাফ) বলে। আর অবৈধ কাজে অর্থ সম্পদ ব্যয় করাকে تبذير (তাবযীর) বলে। (মা'আরিফুল কুরআন ৫/৪৭০)

এটুকু চিন্তা করলে দেখা যায়, বর্তমান বিবাহ-শাদীর সিংহভাগ অমিতব্যয় তথা তাবযীরের অন্তর্ভুক্ত।

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

তাহকীক ও গ্রন্থনায় :
মুফতী নূর মুহাম্মদ

"সিরাতে মুস্তাকীম" বা সরল পথ

নামাযের ক'টি মাসায়েল : বিভ্রান্তি ও নিরসন-৬

কুরআন-সুন্নাহর আলোকে কাযা নামায পড়ার বিধান

মাওলানা মুফতী মনসূরুল হক্ব

কুরআন ও সুন্নায় তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতের আলোচনার পর নামাযের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। চাই তা সময়মতো আদায় করা হোক অথবা ওয়াক্তের পর কাযা করা হোক। বস্তুত শরীয়তে ঈমানের পরেই নামাযের স্থান এবং নামায ইসলামের অন্যতম স্তম্ভ। কেউ যদি কোনো কারণে সময়মতো নামায পড়তে না পারে তাহলে পরবর্তীতে তা কাযা করা জরুরি।

এ ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহ থেকে দলিল উল্লেখ করা হলো :

(১) পবিত্র কুরআনের সূরায়ে নিসার ১০৩ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, ان الصلوة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ' নিঃসন্দেহে মুমিনদের প্রতি নামায অপরিহার্য রয়েছে, যার সময়সীমা নির্ধারিত।'

এই আয়াতে নামাযের সময়সীমা নির্ধারিত হওয়ার বিষয়টি যেমন উল্লিখিত হয়েছে, তেমনি নির্ধারিত সময়ে নামায আদায় করা না হলে পরবর্তীতে উক্ত নামায কাযা করার বিষয়টিও পরোক্ষভাবে উল্লিখিত হয়েছে। কারণ এটা আল্লাহ তা'আলার ঋণ, আর ঋণ সময়মতো আদায় না করতে পারলে পরবর্তীতে তা আদায় করা জরুরি। যেমন সামনের হাদীসে ইরশাদ হচ্ছে :

(২) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এক মহিলা নবীজি (সা.)-এর নিকট এসে বলল, আমার মা মান্নত করেছিলেন যে, তিনি হজ্ব করবেন। কিন্তু তা পুরা করার আগেই তিনি মারা যান। (এখন আমার করণীয় কী?) নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন যে, حجى عنها ارأيت لو كان على امك دين اكنت قاضية؟ اقضوا الله فالله احق بالوفاء 'তুমি তোমার মায়ের পক্ষ থেকে হজ্ব করে নাও। বলো তো, যদি তোমার মা কারো নিকট ঋণী হতেন তুমি কি তার ঋণ পরিশোধ করতে? মহিলা বলল, হ্যাঁ, তখন প্রতিউত্তরে নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন যে, তবে তোমরা আল্লাহর ঋণকেও পরিশোধ করো। কেননা, তিনি তাঁর প্রাপ্য পাওয়ার অধিক উপযুক্ত। (সহীহ বুখারী ১/২৪৯, নাসাঈ ২/২)

এই হাদীস থেকে স্পষ্ট বোঝা গেল, যে ইবাদাত বান্দার ওপর ফরয বা অবশ্য কর্তব্য তা বান্দার ওপর আল্লাহ তা'আলার পাওনা বা ঋণ। এই ঋণ থেকে দায়মুক্তির পথ হলো তা আদায় করা। যেমনিভাবে মানুষের পাওনা ঋণের নির্ধারিত সময় পার হওয়ার দ্বারা মানুষের ঋণ থেকে দায়মুক্ত হওয়া যায় না, তেমনি নির্ধারিত সময় পার হওয়ার দ্বারা আল্লাহ তাআলার ঋণ থেকেও দায়মুক্ত হওয়া যায় না। আর শরীয়তে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত নামাযের ব্যাপারে এই মূলনীতি যে পুরোপুরি প্রযোজ্য হবে, জ্ঞানী মাত্রই তা বুঝতে সক্ষম।

৩. এক রাতে নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর সাহাবীগণকে নিয়ে সফর করছিলেন। শেষ রাতে বিশ্রামের উদ্দেশে সফর বিরতি দিলেন। হযরত বিলাল (রা.)-কে ফজরের নামাযের জন্য জাগিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব দিলেন। অতঃপর সবাই ঘুমিয়ে পড়লেন। এ দিকে হযরত বিলাল (রা.)ও তন্দ্রাবিভূত হয়ে গেলেন। ফলে সবার ফজরের নামায কাযা হয়ে গেল। নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঘুম থেকে জেগে সূর্য ওঠার কিছুক্ষণ পর সবাইকে নিয়ে ফজরের নামায কাযা করলেন। অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে, ঘুম বা বিস্মৃতির কারণে যার নামায ছুটে গেল, যখন সে জাগ্রত হবে তখন সে যেন তা আদায় করে নেয়। (বুখারী হা. নং ৫৯৭, মুসলিম হা. নং ৬৮১)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, সেই দুই রাকআত যা নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কাযা হিসেবে আদায় করেছেন, আমার নিকট তা সমগ্র দুনিয়ার মালিকানা লাভ করার চেয়েও অধিক পছন্দনীয়। (মুসনাদে আহমাদ ৪/১৮১, মুসনাদে আবী ইয়ালা ৩/২২-২৩, হা. নং ২৩৭১)

৪. খন্দকের যুদ্ধ থেকে ফেরার দিন নবীজি (সা.) তাঁর সাহাবীদেরকে বনূ কুরাইযা অভিমুখে পাঠানোর সময় বললেন, لايصلين احد العصر الا فى بنى قريظة 'তোমাদের কেউ যেন বনী কুরাইযায় না পৌঁছে আসরের নামায না পড়ে।' (সহীহ বুখারী ১/১২৯, হা. নং ৪১১৯, সহীহ মুসলিম ২/৯৬) সাহাবায়ে কেরাম (রা.) রওনা হলেন। পথে আসরের নামাযের সময় অতিবাহিত হওয়ার উপক্রম হলে কিছু সাহাবী পথেই সময়ের ভেতর আসর পড়ে নেন। আর কিছু সাহাবী বনী কুরাইযায় পৌঁছার পর আসরের নামায কাযা পড়েন। নবীজি (সা.) এই ঘটনা শুনলেন। কিন্তু পরে

কাযা আদায়কারীগণকে এ কথা বলেননি যে, নামায শুধুমাত্র নির্ধারিত সময়েই আদায়যোগ্য। সময় অতিবাহিত হওয়ার পর এর কোনো কাযা নেই।

সুতরাং এই হাদীস থেকে পরিষ্কার বোঝা গেল যে, কোনো কারণবশত নামায ওয়াক্ত মতো না পড়তে পারলে সেই নামায অবশ্যই কাযা পড়তে হবে। এ কারণে যারা কাযা পড়েছিলেন নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদেরকে সমর্থন করেছিলেন।

৫. স্বয়ং নবীজি (সা.)-এর খন্দকের যুদ্ধের সময় কয়েক ওয়াক্তের নামায কাযা হয়ে গিয়েছিল। তথা যুদ্ধের কারণে সময় মতো পড়া সম্ভব হয়নি। এই নামাযগুলো তিনি কাযা হিসেবে পড়ে নিয়েছিলেন। (বুখারী ১/১৬২, ২/৩০৭)

৬. এ প্রসঙ্গে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল হলো ইজমায়ে উম্মত। মুসলিম উম্মাহর সকল মুজতাহিদ ইমাম এ ব্যাপারে একমত যে, ফরয নামায নির্ধারিত সময়ে আদায় করা না হলে সময়ের পরে তা কাযা করতে হবে। এ ব্যাপারে ইচ্ছাকৃতভাবে কাযা করা বা উযরবশত কাযা হয়ে যাওয়া উভয় প্রকারের বিধানই সমান।

যেমন, মালেকী মাযহাবের সুপ্রসিদ্ধ ইমাম ইবনে আব্দুল বার (রহ.) বিনা উযরে অনাদায়কৃত নামায কাযা করা অপরিহার্য হওয়ার স্বপক্ষে শরয়ী প্রমাণাদি উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন,

ومن الدليل على ان الصلوة تصلى وتقضى بعد خروج وقتها كالصائم سواء وان كان اجماع الامة الذين امرمن شذ منهم بالرجوع اليهم وترك الخروج عن سبيلهم يغنى عن الدليل فى ذالك .... الاستذكار ১/৩০২

'ফরয রোযার মতো ফরয নামাযও সময় অতিবাহিত হওয়ার পরে কাযা করতে হয়। এ ব্যাপারে যদিও উম্মতের ইজমাই যথেষ্ট দলিল। যার অনুসরণ করা ওইসব বিচ্ছিন্ন মতের প্রবক্তাদের জন্যও অপরিহার্য ছিল। তার পরও কিছু দলিল উল্লেখ করা হলো, যথা নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বাণীসমূহ....(আল ইসতিযকার : ১/৩০২-৩০৩)

এ ছাড়া হাদীসের প্রত্যেক কিতাবে 'বাবু কাযাইল ফাওয়ায়েত' তথা ছুটে যাওয়া নামায কাযা করার অধ্যায় নামে কাযা নামায পড়ার পদ্ধতির ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। কাযা নামায আদায় করা জরুরি হওয়ার ব্যাপারে এটাও মযবূত প্রমাণ।

তা ছাড়া এ ব্যাপারে আরো অনেক হাদীস ও সাহাবা কেরামের ফাতাওয়া রয়েছে। বেশি দীর্ঘ হওয়ার আশংকায় এখানে শুধুমাত্র একটি আয়াত ও কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করা হলো। এর দ্বারাই সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো যে, কাযা নামায আদায় করা জরুরি। এ ব্যাপারে উম্মতের নির্ভরযোগ্য উলামায়ে কেরাম একমত।

তার পরও আমাদের কিছু দ্বীনি ভাই যারা নিজেদেরকে 'আহলুল হাদীস' বলে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করেন, তারা কাযা নামায আদায়ের বিধানকে সহীহ হাদীসের খেলাফ মনে করেন এবং মুসলিম জনসাধারণকে কিছু হাদীসের বাহ্যিক অর্থ দ্বারা বিভ্রান্ত করে থাকেন। এ সম্পর্কে তারা যেসব দলিল পেশ করে থাকেন তা নিম্নরূপ :

(১) নবীজি (সা.) বলেন, من ترك الصلوة فقد كفر 'যে ব্যক্তি নামায ছেড়ে দিল সে কাফের হয়ে গেল।' আর অপর এক হাদীসে নবীজি (সা.) বলেন, ان الاسلام يهدم ماكان قبله وان الهجرة تهدم ماكان قبلها 'ইসলাম গ্রহণ করলে অতীত গুনাহসমূহ আল্লাহ তা'আলা মাফ করে দেন। অনুরূপভাবে হিজরত করলেও হিজরতের পূর্ববর্তী গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়।'

সুতরাং উক্ত দুই হাদীসের আলোকে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, নামায পরিত্যাগ করার কারণে মুসলমান কাফের হয়ে যায়। এখন পুনরায় মুসলমান হওয়া তার কর্তব্য। যখন সে পুনরায় মুসলমান হয়ে যাবে তখন তার কাযা নামায আদায় করার প্রয়োজন নেই। কারণ মুসলমান হওয়ার দ্বারা আগের সব গুনাহ মাফ হয়ে গেছে।

অথচ নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগ থেকে আজ পর্যন্ত কোনো ইমাম বা হাদীস ব্যাখ্যাকারী এই হাদীস দুইটির এ জাতীয় ব্যাখ্যা করেননি। একমাত্র আহলুল হাদীস ভাইয়েরাই এই ব্যাখ্যা করেছেন। এ উভয় হাদীসের সঠিক ব্যাখ্যা নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

প্রথম হাদীসের ব্যাখ্যা : যে ব্যক্তি নামায পরিত্যাগ করল তার এই কাজটি কেমন যেন কাফেরদের কাজের মতো হলো। কিন্তু লোকটি এর দ্বারা কাফের হবে না।

দ্বিতীয় হাদীসের ব্যাখ্যা : কোনো অমুসলিম মুসলমান হলে আল্লাহ তা'আলা মেহেরবানী করে তার অতীত গুনাহসমূহকে ক্ষমা করে দেন। কিন্তু কোনো ইমাম এই অর্থ করেননি যে, কোনো মুসলমান নামায ত্যাগ করে কাফের হয়ে পুনরায় মুসলমান হলে তার পেছনের কাযা নামায পড়া লাগবে না। বরং পূর্বে উল্লিখিত আয়াত, হাদীস ও ইজমায়ে উম্মত দ্বারা এই কথাই প্রমাণিত হলো যে, উমরী কাযা নামায আদায় করা তেমনি ফরযে আইন যেমনটি সময়মত আদায় করা ফরযে আইন। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে উক্ত বিধানের ব্যাপারে যত্নবান হওয়ার তাওফীক দান করুন।

ইসলামী অর্থনীতি

মুদ্রার তাত্ত্বিক পর্যালোচনা ও শরয়ী বিধান-১

মাওলানা আনোয়ার হোসাইন

ইসলাম একটি বিশ্বব্যাপী ও সর্বজনীন জীবন ব্যবস্থা। এটা এমন একটা ধর্ম, যা সর্বকালের অবস্থা ও চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং জীবনের সর্বস্তরের বিধিবিধানের সমষ্টি। যাতে রয়েছে জীবনের প্রতিটি শাখা-প্রশাখা সম্পর্কে দিকনির্দেশনা।

মানব জীবনে পারস্পরিক লেনদেনের (Dealing) জন্য মুদ্রার Money অবস্থান মেরুদণ্ডতুল্য। বরং মুদ্রাই পারস্পরিক লেনদেনের মূল ভিত্তি। প্রাচীনকাল থেকেই বিভিন্ন পদ্ধতিতে মুদ্রা ব্যবহারের ধারাবাহিকতা চলে আসছে। ইসলামের পূর্বে এবং পরে বিভিন্ন সময়ে মুদ্রার আকৃতিতে পরিবর্তন হয়েছে এবং তার মূল্য ও মানের Value মধ্যে পরিবর্তন পরিবর্ধন এবং ওঠানামা হতে চলেছে। যার কারণে মুদ্রার অনেক পদ্ধতি এবং প্রকার পরিলক্ষিত হয়। যার ফলে অনেক নিত্যনতুন মাস'আলা উদ্ভাবিত হয়েছে এবং হচ্ছে।

এ বিষয়ে বাংলা ভাষায় যে পরিমাণ কাজ হয়েছে, তা সংক্ষিপ্ততা এবং অপূর্ণাঙ্গতার কারণে প্রায় না হওয়ার মতো। আরব বিশ্বের ওলামায়ে কেরাম যদিও মুদ্রার ওপর গবেষণামূলক কাজ করেছেন এবং মুদ্রার বিভিন্ন প্রকার ও তার বিধিবিধান উল্লেখ করেছেন। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই তাদের মতানৈক্য পাওয়া যায়। যার কারণে চূড়ান্ত ফলাফল পর্যন্ত পৌঁছা অনেক সময় কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। এ ছাড়া মুদ্রার বিবিধ বিধিবিধান গ্রন্থাদিতে বিক্ষিপ্ত আকারে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। আর কিছু পদ্ধতি এখনো গবেষণার দাবি রাখে। যেমন : মুদ্রার প্রকৃত অবস্থা Nature, বিভিন্ন প্রকার বন্ডের শরয়ী বিধান, বিভিন্ন দলিল-দস্তাবেজের শরয়ী পর্যালোচনা এবং তা কবজা করার শরয়ী নির্দেশনা। বর্তমান যুগে মুদ্রাস্ফীতির কারণে সৃষ্ট মাস'আলার শরয়ী সমাধান। বক্ষমান প্রবন্ধে মুদ্রা সংক্রান্ত সামগ্রীক বিষয়ে একটি মৌলিক ধারণা তুলে ধরার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

মুদ্রা পরিচিতি ও তার মূল তত্ত্ব :

ফুকাহায়ে কেরামের নিকট মুদ্রার সংজ্ঞা

আরবী ভাষায় মুদ্রাকে نـقـد বলে, যার বহুবচন হচ্ছে- نقود

প্রাচীন ফেক্বহী বচনভঙ্গি ও মূল সূত্রের ওপর পর্যালোচনা করলে পরিলক্ষিত হয় যে, তাদের দৃষ্টিতে মুদ্রা শব্দের ব্যবহার এত ব্যাপক নয়। যতটুকু ব্যাপকতা অর্থনীতিবিদদের নিকট রয়েছে। সুতরাং ফুকাহায়ে কেরামের বচনশৈলীর ওপর গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে বোঝা যায় যে, তাদের নিকট মুদ্রা শব্দের প্রয়োগের ক্ষেত্রে তিন ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে।

প্রথম দৃষ্টিভঙ্গি :

মুদ্রা শব্দ দ্বারা সাধারণত সোনা-রুপাকে বোঝায়, চাই তা শৈল্পিক নৈপূণ্যে তৈরিকৃত মুদ্রা আকারে হোক বা টুকরা আকারে হোক। (ফতহুল ক্বদীর ৬/১৫৮, তুহফাতুল মুহতাজ ৪/২৭৯)

দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গি :

মুদ্রা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, শুধু শৈল্পিক নৈপূণ্যে তৈরিকৃত মুদ্রা। কাজেই সোনা-রুপার পাত্র টুকরা বা তা থেকে তৈরিকৃত অন্য কোনো জিনিসকে মুদ্রা বলা যাবে না। (ফতহুল ক্বদীর ৬/২৫৯) উল্লিখিত উভয় দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী পয়সা Pices বা অন্যান্য জিনিসের ওপর মুদ্রা শব্দটি প্রয়োগ করা যাবে না।

তৃতীয় দৃষ্টিভঙ্গি :

যদিও মূলত মুদ্রা শব্দটি দ্বারা সোনা-রুপাকেই বোঝায়। তবে সোনা-রুপা ছাড়া অন্যান্য জিনিসের ক্ষেত্রেও শব্দটি প্রয়োগ করা যেতে পারে। সুতরাং এ দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী মুদ্রা শব্দের ব্যবহার পয়সার ক্ষেত্রেও হতে পারে। (বাদায়িউস সানায়ে ৫/১৮৫, আল মুগনী ৫/১২৫)

আর যেহেতু পয়সার ওপর তার প্রয়োগ যথার্থ। তাই অন্যান্য জিনিসের ক্ষেত্রেও এ শর্ত সাপেক্ষে প্রয়োগ নিষিদ্ধ হবে না। তবে মুদ্রা শব্দের প্রয়োগের ক্ষেত্রে যেসব শর্তাবলি জরুরি এ ক্ষেত্রেও সেসব শর্তাবলি পাওয়া যেতে হবে।

মোটকথা, ফুকাহায়ে কেরামের নিকট মুদ্রা শব্দটির ব্যবহার তিন পদ্ধতিতে প্রচলিত।

১. শুধু দেরহাম দিনারের ওপর তার ব্যবহার। মুদ্রার এ প্রয়োগবিধি একেবারেই সীমাবদ্ধ এবং সবচেয়ে নির্দিষ্টতর।

২. মুদ্রার প্রয়োগ স্বর্ণ-রুপার ক্ষেত্রে, সোনা-রুপা যে ধরনেরই হোক। প্রথমটির তুলনায় দ্বিতীয়টির মধ্যে ব্যাপকতা একটু বেশি পাওয়া যায়।

৩. তৃতীয় পদ্ধতিটি সবচেয়ে বেশি ব্যাপক। কেননা এ দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী পয়সার ওপর মুদ্রার প্রয়োগ হয়।

উল্লেখ্য, পয়সা স্বর্ণ রুপার হয় না বরং তামা-জাতীয় পদার্থের হয়ে থাকে। মুদ্রার তৃতীয় প্রয়োগিক ব্যবহার অর্থনীতিবিদদের দৃষ্টিভঙ্গির প্রায় কাছাকাছি। বিস্তারিত নিম্নরূপ-

অর্থনীতিবিদদের নিকট মুদ্রার ব্যবহার :
প্রখ্যাত ইসলামী অর্থনীতিবিদ মুফতী মুহাম্মদ তৃকী উসমানী সাহেবের মতে- যে জিনিস পরিভাষাগতভাবে এবং তা বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়, মুদ্রার পরিমাণের মাপকাঠি হয়। এবং যার মাধ্যমে বস্তুর মূল্যমান সংরক্ষণ করা যায়, তাকে মুদ্রা বলে। (ইসলাম আউর জাদীদ মায়ীশাত ওয়া তেজারাত)

Prof crowther মুদ্রার সংজ্ঞায় বলেন, যে মুদ্রা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে ওই বস্তু, যা বিনিময় মাধ্যম হিসেবে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয় এবং সাথে সাথে পরিমাণের মাপকাঠি ও পরিমাণ ভাণ্ডারের দায়িত্বও আঞ্জাম দেয়। (তাআরুফে যর ওয়া ব্যাংকারী)

ড. আদনান খালিদ আত্তুরকুমানী এভাবে বলেছেন যে,

النقد عبارة عن كل شئ يلقى قبولا عاما كوسيط للتبادل ومقياس للقيمة مهما كان ذلك الشئ وعلى اى حال يكون۔

অর্থাৎ মুদ্রা প্রতিটি ওই জিনিসকে বলে, যা বিনিময় মাধ্যম হিসেবে সমাদৃত হয় এবং মূল্যের মাপকাঠি হয়, সেটা যে কিছুই হোক না কেন, যে অবস্থাতেই হোক না কেন।

কেওয়াল কৃষ্ণ Kewal Krishan তার গ্রন্থে মুদ্রার সংজ্ঞা এভাবে করেছেন, Money may be defined as the means of valuation and of payments: as both the unit of account and the generally accepted medium of exchange.

এই সংজ্ঞার সারমর্মও আদনান খালিদের সংজ্ঞার অনুরূপ।

উল্লিখিত সংজ্ঞায় বর্ণিত মুদ্রার বৈশিষ্ট্য :
১. বিনিময় মাধ্যম হওয়া। ২. ব্যাপকভাবে সমাদৃত হওয়া। ৩. পরিমাণের মানদণ্ড হওয়া। ৪. সম্পদ সংরক্ষণের মাধ্যম হওয়া।

উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা নিম্নরূপ :

১. বিনিময় মাধ্যম হওয়া

প্রত্যেক মানুষের জীবনে বিভিন্ন জিনিসের প্রয়োজন হয়। কিন্তু প্রত্যেক জিনিস প্রত্যেকের নিকট থাকা জরুরি নয়। সচরাচর আমাদের মধ্যে যা দেখা যায় যে, একটি জিনিস একজনের কাছে আছে কিন্তু আরেকজনের নিকট তা নেই। তখন একজনের সাথে আরেকজনের লেনদেন ও বিনিময় পদ্ধতি কী হবে?

পণ্যকে বিনিময় মাধ্যম বানানো জটিল কেননা প্রত্যেক মানুষের সব সময় প্রতিটি পণ্যের প্রয়োজন হয় না। এবং প্রত্যেকের জন্য প্রত্যেক পণ্যের ওপর সন্তুষ্ট হওয়াও জরুরি নয়। তাই আল্লাহ তা'আলা স্বর্ণ-রুপাকে বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। এবং প্রত্যেক মানুষের অন্তরে উভয়টির প্রতি এমন আকর্ষণ ঢেলে দিয়েছেন যে, প্রত্যেকে স্বভাবগতভাবেও একে গ্রহণ করতে বাধ্য সুতরাং লেনদেনের শুরুলগ্ন থেকে অদ্যাবধি এটা গ্রহণযোগ্য ও সমাদৃত। মৌলিকভাবে এটি এখনও বিনিময়মাধ্যম। যদিও প্রচলনের ক্ষেত্রে মুদ্রার অন্তর্নিহিত মর্ম ব্যাপকতর হতে চলেছে।

২. মুদ্রা ব্যাপকভাবে সমাদৃত হওয়া। কোনো জিনিস মুদ্রা হওয়ার জন্য এর মধ্যে ব্যাপকভাবে গ্রহণযোগ্য হওয়ার গুণাগুণ বিদ্যমান থাকা জরুরি।

৩. মুদ্রা পরিমাণের মানদণ্ড হওয়া। পণ্যের মূল্যের পরিমাণ কী হবে? যদি তার জন্য কোনো মানদণ্ড এবং পরিমাণ নির্ধারণ না হয়। তাহলে প্রত্যেকেই নিজ অনুমান অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের মূল্য নির্ধারণ করবে। যার দ্বারা ঝগড়া সৃষ্টি হবে। উদাহরণস্বরূপ যদি মুদ্রা না থাকত, তাহলে একটি উটের মূল্য পণ্য এবং অন্যান্য জিনিসের বিনিময়ে কী হবে? এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা দুঃসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়াত। মুদ্রা পদ্ধতি এ সমস্যা সমাধান করে দিয়েছে। এখন মুদ্রাকে পরিমাপ এবং মানদণ্ড হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়েছে। এখন মুদ্রা দ্বারা উটের মূল্য নির্ধারণ করা সহজ। পণ্য দ্বারা যেটি অসম্ভব এবং এ ক্ষেত্রে কোনো ঝগড়া বা সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে না।

৪. সম্পদ সংরক্ষণ এর মাধ্যম হওয়া। এর অর্থ হচ্ছে এই যে, কারো নিকট কোনো জিনিস থাকলে এর মূল্য ওঠানামা করতে থাকে। তা ছাড়া এটা কোনো আবশ্যক নয় যে, সব সময়ই এর কোনো ক্রেতা পাওয়া যাবে। এই জন্য তার মূল্যমান সংরক্ষিত নয়। পক্ষান্তরে পণ্যের পরিবর্তে যদি মুদ্রা রাখা হয়। তাহলে সাধারণ অবস্থায় এর দ্বারা সম্পদের মান সংরক্ষিত থাকে। এর দ্বারা যেকোনো জিনিস যখন ইচ্ছা কিনতে পারে।

আলোচনার সারমর্ম :
১. স্বর্ণ-রুপার ক্ষেত্রে মুদ্রা শব্দের ব্যবহারের ওপর সকলে একমত এতে ফুকাহায়ে কেরাম এবং অর্থনীতিবিদ কারো দ্বিমত নেই।

২. একটি অভিমত হচ্ছে এই যে, স্বর্ণ-রুপা যখন দিনার বা দেরহামের আকৃতিতে হয়, তখন তা মুদ্রা বলে গণ্য হবে, অন্যথায় নয়।

৩. এক অভিমত অনুযায়ী এর মধ্যে একটু বেশি ব্যাপকতা ও সম্প্রসারণ পাওয়া যায়। যার মধ্যে পয়সার ওপর ও মুদ্রা শব্দের প্রয়োগ হয়।

৪. এক অভিমত অনুযায়ী এর মধ্যে ব্যাপকতা লক্ষ করা যায় যে, স্বর্ণ-রুপা যেকোনো আকৃতিতেই হোক না কেন? তা মুদ্রার হুকুমের অন্তর্ভুক্ত।

৫. অর্থনীতিবিদদের নিকট মুদ্রার মর্মার্থ আরো বেশি বিস্তৃত এবং তাদের নিকট

মুদ্রা প্রত্যেক ওই জিনিসকে বলে, যার মধ্যে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহ পাওয়া যায়।

৬. পরবর্তী অধিকাংশ ওলামায়ে কেরাম ও মুদ্রার উল্লিখিত ব্যাপক অর্থের ওপর একমত।

মুদ্রার প্রকৃতি The nature of money :

মুদ্রার বাস্তবতা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, তার প্রকৃতি Nature। এটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ মাস'আলা। এটি নির্ণয়ে ব্যর্থ হলে মানবতার সবচেয়ে বড় অভিশাপ ইসলামে কঠিনভাবে নিষিদ্ধ সুদের বিধান প্রয়োগে জটিলতা দেখা দিবে। যেমন সুদের বৈধতার জন্য যে অসার ও ভ্রান্ত টালবাহানা চলে তন্মধ্যে একটা হচ্ছে মুদ্রার সাথে পণ্য Commodity জাতীয় লেনদেন করা। অর্থাৎ যেমনিভাবে কোনো বস্তু যথা–বই, ঘর ইত্যাদি বিক্রি করা যায় এবং তার মূল্য পারস্পরিক সম্মতিক্রমে নির্ধারণ করা যায়। তেমনিভাবে মুদ্রার লেনদেনের ক্ষেত্রেও। তার মূল্য যাই হোক না কেন? Face Value থেকে বেশিও যদি হয় তবুও জায়েয আছে এবং এটা সুদ নয়। তদ্রূপ যখন একটা দোকান বা ঘর ভাড়া দেওয়া যায় এবং বিনিময়ে ভাড়া ও উসুল করা হয় সুতরাং মুদ্রার ক্ষেত্রেও এমনটি হওয়া উচিত। কেননা মুদ্রাও তো একটা বস্তু। মোটকথা, সকল পণ্ডিতদের নিকট মুদ্রা হচ্ছে এক প্রকার Commodity

সারকথা : মুদ্রা তাদের নিকট পণ্যদ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যে হুকুম লেনদেনের ক্ষেত্রে অন্যান্য পণ্যের হয়ে থাকে ওই হুকুম মুদ্রার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। আর যে রীতিনীতি অন্যান্য পণ্যের সাথে অবলম্বন করা হয়, সে রীতিনীতি মুদ্রার সাথেও অবলম্বন করা হবে। তারা পণ্যসমূহকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন।

১. ব্যবহারিক পণ্য (Consumption goods)

২. উৎপাদনমূলক পণ্য (Production goods)

ব্যবহারিক পণ্য দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, এর দ্বারা সরাসরি মানবিক প্রয়োজন পূর্ণ হয়। যেমন তাকে খাওয়া যায় কিংবা পান করা যায় বা তা পরিধান করা যায় ইত্যাদি।

উৎপাদনমূলক পণ্যের উদ্দেশ্য হচ্ছে তা ব্যবসাযোগ্য Tradable হয়, ক্রয়-বিক্রয় করা যায়। এর দ্বারা মুনাফা Profit অর্জন করা যায় এবং ভাড়া Leasing দেওয়া যায়। যারা মুদ্রাকে পণ্য মনে করে তাদের দৃষ্টিতে মুদ্রা দ্বিতীয় প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং অন্যান্য উৎপাদনমূলক পণ্যের ন্যায় মুদ্রার মধ্যেও কম বেশির সাথে ক্রয়-বিক্রয় বৈধ হবে এবং ঋণের বিনিময়ে সুদ Interest নেওয়া ও বৈধ হবে। যেন মুদ্রা তাদের নিকট ব্যবসাযোগ্য পণ্য। তাতে চারিত্রিক কিংবা শরয়ী কোনো সমস্যা নেই। (The Historic Judgment on interest)

মুদ্রার বাস্তবতা ও প্রকৃতির সাথে সম্পৃক্ত উল্লিখিত দৃষ্টিভঙ্গি এতই দুর্বল ও ভিত্তিহীন যে, তা শুধু ইসলামী স্কলারগণই প্রত্যাখ্যান করেননি। বরং অভিজ্ঞ অর্থনীতিবিদগণও তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। আমরা এই প্রবন্ধে সর্বপ্রথম অর্থনীতিবিদদের দৃষ্টিভঙ্গিতে তার ভুল উপস্থাপন করব। অতঃপর ইসলামী স্কলারদের মতামত তুলে ধরব।

অর্থনীতিবিদদের দৃষ্টিতে উল্লিখিত মতামত :

Kewal krishan dewett নিজ গ্রন্থে লিখেন–

How money differs from goods? Goods are mainely of tow types: the consumer goods, and producer of capital goods. It can not be consumed as such. There was a time when some commodities served as money and there are exceptional circumstances in modern time too, e.g, in germany in 1945 when htere was hyper inflation, cigarattes served as money. But normally is not an ordinary consumer good...

এর সারমর্ম এই যে, পণ্যদ্রব্য দু'ধরনের। (১) ব্যবহারিক পণ্য। (২) পুঁজি-জাতীয় উৎপাদনমূলক পণ্য। মুদ্রা সাধারণত প্রথম প্রকারের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। কেননা মুদ্রা মানুষের প্রয়োজন পূরণে সরাসরি কাজে আসে না। তেমনিভাবে মুদ্রা মূলধন-জাতীয় পণ্যও হতে পারে না। মূলধন-জাতীয় পণ্য যেমন–মেশিনারি বা কাঁচামাল মৌলিকভাবে অন্যমাল উৎপাদন করার ক্ষেত্রে সহায়তা করে থাকে। কিন্তু মুদ্রাতে এই বৈশিষ্ট্য নেই। মুদ্রা শুধু আদান-প্রদানের মাধ্যমমাত্র।

প্রফেসর মুহাম্মদ মঞ্জুর আলী নিজ গ্রন্থে লিখেছেন যে, মুদ্রা অর্থাৎ নোট সরাসরি ব্যবহারিক পণ্য নয়। অর্থাৎ মুদ্রা সরাসরি মানবিক প্রয়োজন পূরণ করতে পারে না। কেননা এটা অন্ন-বস্ত্র, বাসস্থানের ক্ষেত্রে সরাসরি ব্যবহৃত হয় না। উদাহরণস্বরূপ কেউ স্বর্ণের মুদ্রা বা কাগুজে নোট অথবা ব্যাংক চেক খেতেও পারে না, পরিধানও করতে পারে না। কোনো ব্যবহারিক পণ্য শুধু দু' অবস্থাতে মুদ্রা হতে পারে। ১. প্রাচীন সভ্যতার পরিত্যক্ত সামাজিকতার ভিত্তিতে বা অসাধারণ অবস্থায়। বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানিরা যখন পরাজিত হলো, তখন সেখানে সিগারেট মুদ্রার স্থান দখল করে নিয়েছিল।

মুদ্রা মূলধন-জাতীয় পণ্য থেকে ও ভিন্ন। কেননা মুদ্রার কার্যক্রম মূলধনী পণ্যের কার্যক্রম থেকে একেবারেই ভিন্ন। এর দ্বারা বোঝা গেল যে মুদ্রা শুধু এই জন্য কাজে আসে যে, বিনিময় মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃত।

Ludwig von mises তার নিজ গ্রন্থে এই দৃষ্টিভঙ্গি খণ্ডন করতে গিয়ে আলাদা একটি অধ্যায় স্থাপন করেছেন Money an economic good মর্মে। সেখানে তিনি উল্লেখ করেছেন-

Money neither a production good nor a consuption good.

অর্থাৎ মুদ্রা মূলধনীয় পণ্যও নয়, ব্যবহারিক পণ্যও নয়। এ অধ্যায়ে লেখক বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন এবং দলিল ও প্রমাণ উল্লেখ করেছেন। তবে পরিশেষে যে ফলাফল বের হয়েছে এবং তা ন্যায়সংগত বলে ঘোষণা দিয়েছেন। তা হলো এই যে, পণ্যের প্রকারভেদ দুই ধরনের নয় বরং তিন ধরনের। (১) উৎপাদনের উপকরণাদি। (২) ব্যবহারের পণ্য। (৩) বিনিময়ের মাধ্যম।

যদি এই দৃষ্টিভঙ্গিকে গ্রহণ করা হয় যে, মুদ্রা মূলধনী পণ্যের অন্তর্ভুক্ত এবং তার সাথে পণ্যের মত লেনদেন করা হয়। তাহলে এটা অ্যাডাম স্মিথের কথা অনুযায়ী মৃত ভাণ্ডার তথা Dead stock হবে, যা কোনো কাজে আসে না। The theory of Money and credit 502.

এ ছাড়া অর্থনীতির ওপর লিখিত গ্রন্থসমূহে মুদ্রার যে সংজ্ঞা ও কার্যকরিতা বর্ণনা করা হয়েছে। তার মধ্যে এ কথার উল্লেখ নাই যে, মুদ্রা উৎপাদনমূলক পণ্যও বরং তাদের সকলেই মুদ্রাকে Media of Exchange অর্থাৎ বিনিময়ের মাধ্যম বলেছেন।

উল্লিখিত দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে ইসলামী অর্থনীতিবিদদের অভিমত :

যেমনিভাবে অর্থনীতিবিদগণ এ দৃষ্টিভঙ্গিকে বাতিল এবং ভিত্তিহীন বলেছেন। তেমনিভাবে আহলে ইসলামও এ অভিমতটি বাতিল বলে সাব্যস্ত করেছেন। ওলামায়ে ইসলামের মধ্যে কেউ এ মতের সমর্থন করেননি। তাদের ভাষায় যদিও সুস্পষ্টত Expressly-এর খণ্ডন পাওয়া যায় না। কিন্তু মুদ্রার যে প্রকৃতি তারা উল্লেখ করেছেন তা থেকে এর খণ্ডন বোঝা যায়। যদিও অনেকে প্রকাশ্যেই এর খণ্ডন করেছেন।

আল্লামা ত্বকী উসমানী সাহেব সুদের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের সুপ্রিম কোর্টে যে ঐতিহাসিক রায় দিয়েছেন। সেখানে তিনি ইসলামী এবং অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণে এ অভিমতের বিস্তারিত খণ্ডন করেছেন। তিনি মুদ্রা ও পণ্যের মধ্যে ইসলামী দৃষ্টিকোণে তিনটি মৌলিক পার্থক্য বর্ণনা করেছেন।

১. মুদ্রা সরাসরি মানুষের প্রয়োজন পূরণ করতে পারে না। মুদ্রা পণ্য Commodities এবং সেবা Services গ্রহণের জন্য ব্যবহার করা হয়। অথচ পণ্য সরাসরি মানবীয় প্রয়োজন পূরণে সক্ষম।

২. বিভিন্ন জিনিসের বিভিন্ন ধরনের মাপকাঠি থাকে। যেমন সস্তা হওয়া দামি হওয়া। পক্ষান্তরে মুদ্রার মধ্যে পরিমাণের মানদণ্ড এবং বিনিময় মাধ্যম ছাড়া এর মধ্যে অন্য কোনো ধরন নেই। এই জন্য একই মূল্যের মুদ্রার সমস্ত একক Units পরস্পরে ১০০% সমান সমান হয়। এক হাজার টাকার নতুন নোট আর পুরাতন নোট মানের দিক দিয়ে সমান হয়।

৩. পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের লেনদেনে ওই সব জিনিসের সাথেই সুনির্দিষ্ট হয়, যেগুলোর মধ্যে এ লেনদেন হয়ে থাকে। যেমন : কেউ নির্দিষ্ট গাড়ি কিনলে বিক্রেতাকে সেই গাড়িই দিতে হবে। পক্ষান্তরে কেউ কাউকে নির্দিষ্ট নোট দেখিয়ে পরবর্তীতে অন্যটা দিলে বিক্রেতা তা নিতে বাধ্য থাকবে। তবে শর্ত হলো উভয়টা একই মূল্যমানের হতে হবে।

এসব মৌলিক পার্থক্য থাকা অবস্থায় মুদ্রার সাথে পণ্যের মতো লেনদেন করা যাবে না। বরং স্বভাবগত দিকের প্রতি বিবেচনা করে শুধু বিনিময় মাধ্যম পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখা হবে।

শাইখুল ইসলাম আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহ.) কয়েক শতাব্দী পূর্বে মুদ্রার প্রকৃতি এভাবে বর্ণনা করেছেন যে,

দেরহাম দিনার মূল উদ্দেশ্য নয়, বরং এটা একটা বিনিময় মাধ্যম এ কারণে এটাকে বিনিময়মূল্য হিসেবে গণ্য করা হয়েছে পক্ষান্তরে অন্যান্য পণ্য। কেননা সেগুলো মূল উদ্দেশ্য হয়ে থাকে।

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহ.) মুদ্রা এবং পণ্যের মাঝে স্পষ্ট পার্থক্য বর্ণনা করেছেন যে, এটা শুধু বিনিময় মাধ্যম মাত্র। মুদ্রা সরাসরি মানুষের প্রয়োজন পূরণ করতে পারে না। (মজমুআ ফতাওয়া ১৯/২৫১)

আল্লামা ইবনুল কায়্যিম (রহ.) এ বিষয়ের ওপর অত্যন্ত সুস্পষ্ট আলোচনা করেছেন।

মুদ্রা লেনদেনের মূল উদ্দেশ্য নয় বরং পণ্য অর্জনের মাধ্যম মাত্র। কেননা, যদি মুদ্রা পণ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় তাহলে মানুষের সব লেনদেন ফাসেদ হয়ে যাবে। (এলামুল মুকিয়ীন ২/১৫৭)

হযরত ইমাম গায্যালী (রহ.) মুদ্রার বাস্তবতা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। যার সার সংক্ষেপ নিম্নরূপ।

আল্লাহ তা'আলার অগনিত নেয়ামতের মধ্য থেকে একটি হচ্ছে দেরহাম ও দিনার। এগুলোর মাধ্যমে দুনিয়ার শৃঙ্খলা ঠিক রয়েছে এবং উভয়টি শুধু

পাথর। এগুলোর মাধ্যমে মানুষ সরাসরি কোনো উপকার ভোগ করতে পারে না। এতদসত্ত্বেও মানুষ এগুলোর প্রতি অনেক মুখাপেক্ষী। কেননা মানুষের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মধ্যে থেকে কিছু নিজের কাছে থাকে আর কিছু থাকে না। ফলে তারা উভয়ে পরস্পরে রদবদল করতে চায়। ফলে তাদের মাঝে লেনদেন ও জরুরি। বিনিময়ের পরিমাণ ও নির্ধারণ করা জরুরি। কেননা এক পণ্যের সাথে অন্য পণ্যের কোনো সামঞ্জস্যতা নেই।

অতএব এমন অবস্থায় তৃতীয় আরেকটি জিনিসের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে, যা উভয়টির পার্থক্যকে সমন্বয় করবে এবং সঠিক মূল্য নির্ধারণ করে দেবে। এই জন্য আল্লাহ তা'আলা সোনা-রুপা সৃষ্টি করেছেন। যাতে উভয়টি দুই অসামঞ্জস্যপূর্ণ জিনিসের মাঝে পার্থক্য নিরসন করতে পারে। এবং এর মধ্যে আল্লাহ তা'আলা এ রহস্য ও নিহিত রেখেছেন যে, এগুলোর মাধ্যমে অন্যান্য জিনিসও অর্জন করা যায়। আর যে ব্যক্তি দেরহাম দিনারের মধ্যে সুদের লেনদেন করে সে যেন আল্লাহর অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল এবং অবিচার করল। কেননা এগুলোর সৃষ্টি নিজের জন্য নয়, বরং পরের জন্য। যেহেতু লেনদেনের ক্ষেত্রে এগুলো মূল উদ্দেশ্য থাকে না। বরং পণ্য অর্জনই মূল উদ্দেশ্য হয়। সুতরাং যে ব্যক্তি এ উভয়টির মধ্যে ব্যবসা করল, সে উভয়টিকে সৃষ্টি রহস্য থেকে দূরে ঠেলে দিল।

কেননা মুদ্রাকে অপাত্রে ব্যবহার করা জুলুম। (ইয়াহয়ায়ে উলূমুদ্দিন ৪/৯১)

সুতরাং মুদ্রার সাথে পণ্যসূলভ ব্যবহার করা এবং তাকে ব্যবসার বস্তু বানানো জুলুম। তাই মুদ্রার ব্যাপারে ন্যায় হলো যে উদ্দেশ্যে তার সৃষ্টি সে উদ্দেশ্যে তাকে ব্যবহার করা।

একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও তার উত্তর :

ইমাম গাজ্জালী (রহ.)-এর উপরিউক্ত বক্তব্যের সারমর্ম এই দাঁড়ায় যে, দেরহাম দিনার শুধু মাধ্যমমাত্র এবং অসামঞ্জস্যপূর্ণ জিনিসের মাঝে সমন্বয়কারী মানদণ্ড তৃতীয় একটা বস্তু। নতুবা এটা কোনো মূল উদ্দেশ্যও নয় আবার ব্যবসাযোগ্য ও নয়। তার ভাষ্য নিম্নরূপ-

যখন কোনো ব্যক্তি এ উভয়টির মূল সত্তা নিয়ে ব্যবসা করে সে যেন উভয়টিকে তার সৃষ্টির রহস্যের বিপরীত ব্যবহার করল। এর ওপর এ প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, তাহলে তো মুদ্রার বিনিময়ে মুদ্রার বেচাকেনা নাজায়েয। অথচ দেরহামের বিনিময়ে দিনার বা তার বিপরীত বিক্রি শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয। এবং তাতে কমবেশি ও বৈধ। এমনিভাবে উভয়টিকে সমশ্রেণীর মুকাবেলায় বিক্রি করাও বৈধ।

এ প্রশ্নে উত্তর ইমাম গাজ্জালী (রহ.) নিজেই দিয়েছেন। দেরহাম দিনার সৃষ্টির আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে এর মাধ্যমে পণ্য অর্জন করা। কিন্তু এ উদ্দেশ্যে এক প্রকারের মুদ্রা অন্য প্রকারের মুদ্রা থেকে ভিন্ন হতে পারে। সুতরাং যদি এই লেনদেন থেকে বারণ করা হয়। তাহলে আসল উদ্দেশ্যে ক্ষতি হবে। এমনিভাবে আমরা সমশ্রেণীর মুদ্রার বিনিময়কেও বৈধতা দিয়েছি। (ইয়াহ ইয়ায়ে উলুমিদ্দীন ৪/৯২)

ইমাম গাজ্জালীর উত্তরের সারাংশ এটাই বের হয় যে, এ সূরতও মূল কায়দা থেকে ব্যতিক্রম নয়। বরং এতেও মুদ্রা বিনিময় মাধ্যম হওয়ার ক্ষেত্রে সহজতা সৃষ্টি করা। মিসরের মুফতী মুহা: খাতির মুদ্রা ও পণ্যের মাঝে পার্থক্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে, মুদ্রাকে যমীন ইত্যাদির ওপর তুলনা করা ঠিক নয়। এবং এ ক্বেয়াস (তুলনাকরন) শরীয়া নিয়মনীতি অনুযায়ীও নয়। কেননা মুদ্রা হচ্ছে বিনিময়মূল্য। আর বিনিময়মূল্য ভাড়া দেওয়া ও নেয়া বৈধ নয়। এই জন্য যে, ইজারা হচ্ছে উপকারিতা চুক্তির নাম। যেখানে উপকার গ্রহণের পর মূল পণ্য ফেরত দেওয়া জরুরি। তাই তো আল্লামা কাসানী (রহ.) বাদায়িউস সানায়ে কিতাবে বলেন–

দেরহাম দিনার এবং এগুলোর টুকরার ইজারা বৈধ নয়। কেননা এগুলো দ্বারা ততক্ষণ পর্যন্ত উপকার গ্রহণ সম্ভব নয় যতক্ষণ পর্যন্ত এগুলোর সর্বস্ব বিলীন না হয়। অথচ ইজারার মধ্যে পণ্যের উপকারিতা অন্তর্ভুক্ত থাকে, মূল পণ্য নয়।

ড. হামদ মিসরী তার কিতাবে এ কথাটি আরো বিশ্লেষণ করে এভাবে বলেছেন যে, যমীন ভাড়া দেওয়া আর মুদ্রা ভাড়া দেওয়ার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। যমীন ভাড়া দেওয়ার পর তার মূল সত্ত্বা বাকি থাকে এবং ইজারাদার শুধু পণ্যের উপকারিতা হাসিল করে এবং শরীয়া দৃষ্টিতে ইজারার মৌলিক প্রকৃতিও তাই। তাছাড়া ইজারার মধ্যে পণ্যের জরিমানা ইজারাদাতার ওপর থাকে। আর মুদ্রার মধ্যে শরীয়তের দৃষ্টিতে ঋণগ্রস্তের ওপর জেমান বা জরিমানা থাকে ঋণদাতার ওপর নয়। (আর রিবা খতরুহু ওয়া সবীলুল খালাস মিনহু ২৮)

সারাংশ : মুদ্রা Money এবং পণ্য Commodity এর মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। যা অধিকাংশ অর্থনীতিবিদদের নিকট স্বীকৃত। এবং শরীয়া বিশেষজ্ঞরাও একমত। তাই মুদ্রার প্রকৃতি Nature অন্যান্য পণ্য থেকে ভিন্নতর হবে। এবং উভয়টার সাথে পৃথক পৃথক মুআমালা হবে। উভয়টার বিধান ভিন্ন ভিন্ন হবে। প্রত্যেককে নিজের মত করে মূল্যায়ন করা হবে। সুতরাং মুদ্রা কেবল বিনিময় মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হবে, পণ্য হিসেবে নয়। মুদ্রাকে ব্যবসার পণ্য মনে করা নিতান্ত অন্যায় এবং পারস্পরিক লেনদেনের শৃঙ্খলা বিনষ্ট করার নামান্তর।

মুদ্রার প্রকারভেদ :

মুদ্রার বিভিন্ন দিক হিসেবে বিভিন্ন প্রকার

বর্ণনা করা হয়েছে। মুদ্রার প্রকারসমূহের সাথে যেহেতু মুদ্রার উন্নতি এবং তার বিভিন্ন ব্যবস্থাপনার সাথে নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। এই জন্য মুদ্রার প্রকারসমূহের ওপর মুদ্রার উন্নতি, মুদ্রার বিভিন্ন ব্যবস্থাপনা এই দুই হেডিংয়ের আলোকে বিস্তারিত বর্ণনা করা হবে। ফেক্বহী নীতিমালার আলোকে মুদ্রার দুটি প্রকার রয়েছে-

১. প্রকৃত মুদ্রা ২. প্রচলিত মুদ্রা

(কাগুজি নোট আওর কারেন্সি কা হুকুম) ছমনে খিলকী তথা প্রকৃত মুদ্রা ওই মুদ্রাকে বলে, যার মুদ্রা হওয়াটা পরিভাষার বা লেনদেনের ওপর নির্ভর নয়। তার মূল্যমান হওয়া অথবা মুদ্রা হওয়াটা পরিভাষার কারণে নয়, বরং স্বভাবজনিত এবং প্রাকৃতিক কারণে। যেন তার সৃষ্টিকরণ Creation এবং তৈরিকরণই মূল্যমান হওয়ার জন্যই হয়েছে। যেমন স্বর্ণ-রুপা যেকোনো আকৃতিতেই হোক না কেন। প্রকৃত মুদ্রা শুধু সোনা আর রুপা। অন্য কোনো জিনিস প্রকৃত মুদ্রা নয়। সোনা-রুপা ব্যতীত মুদ্রা জাতীয় অন্য জিনিসই পারিভাষিক মুদ্রা।

সুতরাং পারিভাষিক মুদ্রা ওই মুদ্রার নাম যার মূল্যমান হওয়াটা মানুষের পারিভাষিক নীতির ওপর নির্ভরশীল। যদি ব্যবসায়ীদের উরফ বা প্রচলন না হতো তাহলে ওই বস্তু ছমন/মুদ্রা হতো না। যেমনটা বর্তমান সময়ে প্রচলিত ব্যাংক নোট ইত্যাদি।

একটি গুরুত্বপূর্ণ ফায়দা :

এখানে একটি প্রশ্ন হয় যে, সোনা-রুপা তো খনিজ পদার্থ এ কারণে উভয়টিকে পাথর বলা হয়। তাহলে অন্যান্য পদার্থগুলো বাদ দিয়ে অথচ তন্মধ্যে এমন কিছুও আছে, যা অত্যন্ত মূল্যবান তা সত্ত্বেও এটাকে কেন শুধু সমনে খিলকী বা প্রকৃত মুদ্রা হিসেবে ব্যবহার করা হয়?

উত্তর : আল্লাহ তা'আলা সোনা-রুপার মধ্যে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য রেখেছেন, যেগুলো অন্যান্য খনিজ পদার্থে এক সাথে পাওয়া যায় না, তা যতই মূল্যবান হোক না কেন।

বৈশিষ্ট্য : ১. উল্লিখিত পাথরদ্বয় সহজে গলে যায়। সহজে এগুলোকে চূর্ণ করা হয়। ২. সোনা-রুপা সহজে পৃথক করা যায়। এবং পূনরায় সহজে জোড়া লাগানো যায়। ৩. সোনা-রুপা দ্বারা যেকোনো জিনিসের আকৃতি সহজে গঠন করা যায়। ৪. সোনা-রুপার মধ্যে কখনো দুর্গন্ধ সৃষ্টি হয় না। তা উপভোগের মধ্যে কোনো পরিবর্তন আসে না। ৫. এ দুটি ধাতুকে যত দিনই পুঁতে রাখা হোক, এর মধ্যে কোনো পরিবর্তন দেখা যায় না। ৬. এগুলোকে আল্লাহ তা'আলা এমন নিপুণ আকৃতিতে বানিয়েছেন যে, এগুলোর কৃত্রিমতা তৎক্ষণাৎই ধরা পড়ে। ৭. এ দুটি ধাতুর পরিধি ছোট হয়। ৮. এগুলো মানুষকে যতটুকু সৌন্দর্যমণ্ডিত করতে পারে অন্যগুলো ততটুকু পারে না। ৯. অন্যান্য ধাতুর তুলনায় সোনা-রুপার উৎপাদন কম। ১০. এগুলোর প্রকার (Classification)-এর মধ্যে সমতা পাওয়া যায়। (মুকাদ্দামা ফিন্নুকুদ ওয়াল বুনুক ৩৪)

মুদ্রা এবং সম্পদের মধ্যে পার্থক্য :

মুদ্রা Money এবং সম্পদের Wealth ক্ষেত্রে সহজ ব্যাখ্যা হচ্ছে এই যে, মুদ্রা হচ্ছে সম্পদের একটা প্রকার। অর্থাৎ সম্পদ হচ্ছে ব্যাপক আর মুদ্রা হচ্ছে নির্দিষ্ট বা বিশেষ সম্পদের মুকাবেলায়, যার অবস্থান হচ্ছে শুধু একটি প্রকার মাত্র। কেননা আল্লামা ইবনে নুজাইম সম্পদের সংজ্ঞা এভাবে করেছেন-

"সম্পদ ওই জিনিসকে বলে, মানুষ যার মালিক হয়, সেটা মুদ্রা, পণ্য বা পশুপাখি হোক কিংবা অন্য কিছু।" (আল-বাহরুর রায়েক)

আল্লামা ইবনে মঞ্জুর সম্পদের সংজ্ঞা এভাবে করেছেন- "সম্পদ ওইসব বস্তুর নাম যেগুলোর তুমি মালিক।" (লিসানুল আরব ১৩/২২৩)

মুদ্রা এবং কারেন্সি নোটের পার্থক্য :

টাকা-পয়সা, ধন-দৌলত, স্বর্ণপাতের সংজ্ঞা পূর্বে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ যা বিনিময় মাধ্যম হয়। মূল্যমান নির্ধারণের মানদণ্ড হয় এবং সম্পদ সংরক্ষণের মাধ্যম হয়। তবে এটা আবশ্যক নয় যে, আইনগতভাবেও একে বাধ্যতামূলক বিনিময় মাধ্যম হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, চেক বা প্রাইজবন্ডের ওপর উল্লিখিত সংজ্ঞাটি প্রযোজ্য হয়। সুতরাং এটা মুদ্রা তো অবশ্যই তবে যদি কোনো ব্যক্তি নিজ ঋণের ক্ষেত্রে চেক বা বন্ড গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। তাহলে তাকে এর ওপর আইনগতভাবে বাধ্য করা যায় না।

আর কারেন্সি বলতে ওই মুদ্রাকে বোঝায়, যাকে কোনো নির্দিষ্ট রাষ্ট্রে বিনিময় মাধ্যম হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়েছে। যদি কোনো ব্যক্তি টাকার মাধ্যমে দেনা পরিশোধ করে তাহলে আইনগতভাবে তাকে তা নেওয়ার ওপর বাধ্য করা হবে। এর দ্বারা বোঝা যায় যে, মুদ্রা হচ্ছে ব্যাপক আর কারেন্সি হচ্ছে বিশেষায়িত।

সম্পদ এবং মুদ্রার মুকাবেলায় মুদ্রা হচ্ছে নির্দিষ্ট আর সম্পদ হচ্ছে ব্যাপক। আর মুদ্রা এবং কারেন্সির মধ্যে কারেন্সি খাছ আর মুদ্রা হচ্ছে ব্যাপক।

কারেন্সি দুই প্রকার :

(১) এমন কারেন্সি যার মধ্যে নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত আইনগতভাবে পরিশোধ করা যায়। এর চেয়ে বেশি পরিমাণে দেওয়া হলে আইনগতভাবে তাকে তা নেওয়ার জন্য বাধ্য করা হবে না। যেমন- চার আনার পয়সাকে Limited legal tender বলে।

(২) দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে- যার মধ্যে আইনত পরিশোধের সীমা নির্ধারিত থাকে না। যাকে Unlimted legal tender বলে। (ইসলাম আওর জদীদ মায়ীশত ওয়া তিজারত)

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

রাসূল (সা.)-এর সুন্নাত তরিকায় নামায পড়ি

মুফতী রফিকুল ইসলাম আল-মাদানী

ইসলামের স্তম্ভ পাঁচটি। ঈমান গ্রহণের পর ইসলামে নামাযের গুরুত্ব সর্বাপেক্ষা বেশি। মুসলমান হিসেবে গোটা বছর একমাত্র নামাযই আমাদের প্রতিদিনের ফরয দায়িত্ব। আল্লাহর সাথে কথা বলতে ত্বোর পাহাড়ে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। আরশে পৌঁছা আমাদের সাধ্যে নেই। নামাযই মোমেনদের মেরাজ। বান্দা ও প্রভুর মধ্যে নির্জন সেতুবন্ধের শ্রেষ্ঠতম উপায়। পরকালে আমাদেরকে প্রতিটি আমলের হিসাব দিতে হবে মহান আল্লাহর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে। জিজ্ঞাসার শীর্ষ তালিকায় থাকবে নামায সম্পর্কীয় মোকাদ্দামা। সেই নামায আদায়কারীর সংখ্যা এ বিশ্বে আজ কত জন? আর আমরা যারা নামায আদায় করি তাদের কত জনের নামায হচ্ছে সহীহ শুদ্ধভাবে, রাসূল (সা.)-এর সুন্নাত তরিকা মতে। এর জন্য শুধু আমাদের অজানাই দায়ী নয়। রয়েছে যথেষ্ট অবহেলা। আল কুরআনের ভাষায় নামাযে অবহেলা করা মুনাফিকের অন্যতম নিদর্শন। (সূরায়ে নিসা ১৪২) আমরা কি মুনাফিক? না, আমরা সত্যিকার মুসলমান। তাহলে সঠিকভাবে নামায আদায়ে আমাদের কেন অবহেলা? এ বিষয়ে জানার প্রশ্নে আমাদের কেন উদাসীনতা?

অসংখ্য হাদীসে মহানবী (সা.) সহীহ শুদ্ধভাবে নামায আদায় করার প্রতি উৎসাহিত করেছেন। যথাযথভাবে নামায আদায় না করে শুধু দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে নামায পরিপূর্ণ হয় না। বরং সামান্য ত্রুটি বা অবহেলার কারণে নামায হয় অশুদ্ধ ও মূল্যহীন। এমন স্পষ্ট বর্ণনা বিভিন্ন হাদীসে এসেছে। "জনৈক সাহাবী মসজিদে নববীতে প্রবেশ করে নামায আদায় করেন। অতঃপর রাসূল (সা.)-এর কাছে এসে তাঁকে সালাম করেন। রাসূল (সা.) সালামের উত্তর দিয়ে তাকে বলেন, "তুমি পুনরায় গিয়ে নামায আদায় করো, তুমি নামায আদায় করোনি।" অতঃপর ওই সাহাবী নামায আদায় করে রাসূল (সা.)-এর কাছে এসে সালাম করেন। রাসূল (সা.) সালামের উত্তর দিয়ে তাকে বলেন, "তুমি পুনরায় গিয়ে নামায আদায় করো, তুমি নামায আদায় করোনি।" এভাবে ওই লোকটিকে রাসূল (সা.) তিনবার একই ধরনের নির্দেশ দেন। অতঃপর ওই লোকটি বলেন, আপনাকে যিনি সত্যের বাণী দিয়ে প্রেরণ করেছেন তাঁর শপথ করে বলছি, আমি এর চেয়ে উত্তমরূপে নামায আদায় করতে পারি না, আমাকে তা শিক্ষা দেন। রাসূল (সা.) তখন তাকে পূর্ণাঙ্গ নামায যথাযথভাবে শিক্ষা দেন। (বুখারী হা. ৭৯৩, ৬২৫১)

বিচারপতি আল্লামা তাকী উসমানী (দা. বা.) কতই না সুন্দর লিখেছেন, নবীজির (সা.) সুন্নাত মুতাবেক নামায আদায় করা ও এর ব্যতিক্রমভাবে আদায় করাতে সময়ের কোনো ব্যবধান হয় না। সুন্নাত মতো নামায আদায় করতে পরিশ্রম বেশি হয় না, হয় না টাকা-পয়সা বা অন্য কোনো সামগ্রীর প্রয়োজন। তবে প্রয়োজন শুধু জানা, আর অবহেলা ও উদাসীনতাকে চিরতরে বিলীন করে দেয়া। রাসূলের (সা.) আদর্শে উজ্জীবিত হওয়ার আগ্রহ সৃষ্টির প্রয়োজন। প্রয়োজন প্রভুকে সন্তুষ্ট করার প্রেরণায় সুদৃঢ়চিত্তে এবাদতে মগ্ন হওয়ার। তবেই সহজ হবে সব ব্যবস্থা, সফল হবে চেষ্টা প্রচেষ্টা।

মনে করুন, নামাযে পায়ের পাতাগুলো কিবলামুখী করে দাঁড়ানো সুন্নাত। পায়ের পাতাগুলোকে কিবলামুখী করা আর না করার মধ্যে সময়ের কোনো ব্যবধান নেই। নেই এখানে সাধ্য অসাধ্যের কোনো বিষয়। এখানে আগ্রহ ও মননশীলতার প্রয়োজন। আছে জানার প্রয়োজন। তাই নামাযের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যাবতীয় সুন্নাতগুলো হাদীস গ্রন্থের উদ্ধৃতি সহকারে অতি সংক্ষেপে আমরা আল আবরার পরিবারের হাতে তুলে দেয়ার চিন্তা করেছি। এ আয়োজন থেকে কেউ সামান্যতম উপকৃত হলে তা আমাদের জন্য মুক্তির উপায় হবে। হবে সবার জন্য শ্রেষ্ঠ সম্বল। উল্লেখ্য, নামাযে যেসকল ক্ষেত্রে মহিলাদের জন্য ভিন্নতা রয়েছে তাও স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

নামাযের সুন্নাতসমূহ

নামাযে দাঁড়ানো অবস্থায় সুন্নাত ১১টি

১. উভয় পায়ের আঙুলসমূহ কিবলামুখী করে স্বাভাবিকভাবে দাঁড়ানো। (বুখারী ২/৯২৪ হা. ৬২৫১, তিরমিযী ১/৬৬ হা. ৩০৪ সহীহ) (বিজ্ঞ ইমামগণের গবেষণা মতে পুরুষদের উভয় পায়ের মধ্যে নিম্নে চার আঙুল, উর্ধ্বে একবিঘত পরিমাণ ফাঁকা রাখা হবে স্বাভাবিক পরিমাণ।)

মহিলাগণ উভয় পায়ের গোড়ালি

মিলিয়ে রাখবে। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ১/২৭০ হা. ২৭৯৪ সহীহ)

২. তাকবীরে তাহরীমার সময় চেহারা কিবলার দিকে রেখে নজর সিজদার স্থানে রাখা এবং হাত উঠানোর সময় মাথা না ঝুঁকানো। (মুস্তাদরাকে হাকেম ১/৪৭৯ হা. ১৭৬১ সহীহ, তিরমিযী ১/৬৬ হা. ৩০৪ সহীহ)

৩. উভয় হাত কান পর্যন্ত উঠানো। অর্থাৎ উভয় হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলির মাথা কানের লতি পর্যন্ত উঠানো। (মুসলিম ১/১৬৮ হা. ৩৯১)

* মহিলাগণ তাদের হাত বুক বা কাঁধ পর্যন্ত উঠাবে এবং কাপড়ের ভেতর থেকে হাত বাহির করবে না। (তিরমিযী ১/২২২ হা. ১১৭৩ সহীহ, তাবরানী কাবীর ৯/১৪৪ হা. ১৭৪৯৭ সহীহ, ২২/২০ হা. ২৮ হাদীসটি গ্রহণযোগ্য)

৪. হাত উঠানোর সময় আঙ্গুলসমূহ ও হাতের তালু কিবলামুখী রাখা। (তিরমিযী ১/৫৬ হা. ২৪০ সহীহ, তাবরানী আউসাত ৮/৪৪ হা. ৭৮০১)

৫. আঙ্গুলসমূহ স্বাভাবিক রাখা অর্থাৎ একেবারে মিলিয়েও না রাখা, আবার বেশি ফাঁকা ফাঁকাও না রাখা। (মুস্তাদরাক-১/২৩৪ হা. ৮৫৬ সহীহ)

৬. ইমামের তাকবীরে তাহরীমা বলার পর সাথে সাথে মুক্তাদীর তাকবীরে তাহরীমা বলা। তবে যেন ইমামের তাকবীরে তাহরীমার পূর্বে মুক্তাদীর তাকবীরে তাহরীমার নিঃশ্বাস সমাপ্ত না হয় তা লক্ষ রাখতে হবে। এরূপ হলে মুক্তাদীর নামায ভেঙে যাওয়ার আশঙ্কা আছে। (বুখারী ১/১০১ হা. ৭৩৪, মুসলিম ১/১৭৭ হা. ৪১৪, ৪১৫)

৭. হাত বাঁধার সময় ডান হাতের তালু বাম হাতের পিঠের (পাতার) ওপর রাখা। (নাসাঈ ১/১০২ হা. ৮২৮ সহীহ)

৮. ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি ও কনিষ্ঠাঙ্গুলি দ্বারা গোলাকার বৃত্ত বানিয়ে বাম হাতের কবজি শক্তভাবে ধরা। (তিরমিযী-১/৫৯ হা. ২৫২, নাসাঈ-১/১০২ হা. ৮৮৬, ইবনে মাজাহ-৫৬ হা. ৮১১, মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ১/৩৪৩ হা. ৩৯৪২)

৯. উপরে ৮ নাম্বারে উল্লিখিত হাদীসের আলোকে বিজ্ঞ ইমামগণ বলেন, অবশিষ্ট তিন আঙুল বাম হাতের ওপর স্বাভাবিকভাবে বিছিয়ে রাখবে।

মহিলাগণ ডান হাতের তালু বাম হাতের পিঠের ওপর স্বাভাবিকভাবে রাখবে। পুরুষের মতো শক্ত করে ধরবে না।

১০. নাভির নিচে হাত বাঁধা। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ১/৩৯০ হা. ৩৯৫৯ সহীহ)

* মহিলাগণ তাদের হাত কাপড়ের ভেতরে (বুকের ওপর) রাখবে। (তিরমিযী ১/২২২ হা. ১১৭৩ হাসান)

১১. ছানা পড়া। (আবু দাউদ ১/১১৩ হা. ৭৭৫, ৭৭৬ সহীহ)

নামাযে ক্বিরা'আতের সুন্নাত ৭টি

১. প্রথম রাকা'আতে ছানা পড়ার পর পূর্ণ আ'উযুবিল্লাহ পড়া। (আবু দাউদ- ১/১১১ হা, ৭৬৪/ ইবনে মাজাহ- ১/৪৪৩ হা. ৮০৭)

২. প্রতি রাকা'আতে সূরা ফাতিহা ও সূরা মিলানোর পূর্বে পূর্ণ বিসমিল্লাহ পড়া। (নাসাঈ ১/১০৪ হা. ৯০৪)

৩. সূরা ফাতিহার পর ইমাম, মুক্তাদি বা একাকী নামাযী সবাই নীরবে 'আমীন' বলা। (বুখারী ১/১০৮ হা. ৭৮২, মুস্তাদরাকে হাকেম ২/২৩২, হা. ২৯১৩, সুনানে দারাকুতনী-১/২৬৩ হা. ১২৫৬)

৪. ফজর এবং যোহরের নামাযে ত্বিওয়ালে মুফাসসাল (লম্বা ক্বিরা'আত) অর্থাৎ সূরা 'হুজুরাত' থেকে সূরা 'বুরূজ' পর্যন্ত যেকোনো সূরা পড়া। আসর এবং ইশার নামাযে আউসাতে মুফাসসাল (মধ্যম ক্বিরা'আত) অর্থাৎ সূরা 'ত্বারিক' থেকে সূরা 'লাম-ইয়াকুন' পর্যন্ত যেকোনো সূরা পড়া। মাগরিবে ক্বিসারে মুফাসসাল (ছোট ক্বিরা'আত) অর্থাৎ সূরা 'ইযা-যুলযিলাত্' থেকে সূরা 'নাস' পর্যন্ত থেকে যেকোনো একটি সূরা পড়া অথবা অন্য বড় সূরা থেকে এ পরিমাণ ক্বিরা'আত পাঠ করা। (নাসাঈ ১/১১৩ হা. ৯৮২, মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক-২/১০৪ হা. ২৬৭২)

৫. ফজরের প্রথম রাক'আত দ্বিতীয় রাক'আত অপেক্ষা লম্বা করা। অন্যান্য ওয়াক্তে উভয় রাক'আতে ক্বিরা'আতের পরিমাণ সমান রাখা উচিত। (মুসলিম ১/১৮৬ হা. ৪৫১, ৪৫২)

৬. ক্বিরা'আত অত্যন্ত তাড়াতাড়ি বা একেবারে ধীর গতিতে না পড়া, বরং মধ্যম গতিতে পড়া। (মুসলিম ১/২৫৩ হা. ৭৩৩)

৭. ফরয নামাযের তৃতীয় এবং চতুর্থ রাক'আতে শুধু সূরা ফাতিহা পড়া। (বুখারী ১/১০৭ হা. ৭৭৬, মুসলিম ১/১৮৫ হা. ৪৫১)

নামাযে রুকুর সুন্নাত ৮টি

১. তাকবীর বলা অবস্থায় রুকুতে যাওয়া। (বুখারী ১/১০৮ হা. ৭৮৯)

২. উভয় হাত দ্বারা শক্তভাবে হাঁটু ধরা। (বুখারী ১/১০৯ হা. ৭৯০)

৩. হাতের আঙুলসমূহ ফাঁকা করে ছড়িয়ে রাখা। (আবু দাউদ-১/১০৬ হা. ৭৩১ সহীহ, মুসনাদে আহমদ ৪/১২০ হা. ১৭০৮৫ সহীহ)

* মহিলাগণ উভয় হাত হাঁটুর ওপর স্বাভাবিকভাবে রাখবে, পুরুষদের মতো শক্ত করে ধরবে না এবং আঙুলগুলো মিলিয়ে রাখবে।

(মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক ৩/১৩৭ হা. ৫০৬৯ সহীহ)
৪. উভয় হাত সম্পূর্ণ সোজা রাখা, কনুই বাঁকা না করা। (আবু দাউদ-১/১০৭ হা. ৭৩৪ হাসান)
* মহিলাগণ তাদের উভয় বাহু পাঁজরের সঙ্গে মিলিয়ে রাখবে। (মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক ৩/১৩৭ হা. ৫০৬৯ সহীহ)
৫. পায়ের গোছা, হাঁটু ও উরু সম্পূর্ণ সোজা রাখা। হাঁটু সামনের দিকে বাঁকা না করা। (আবু দাউদ-১/১২৫ হা. ৮৬৩ হাসান, মুসনাদে আহমদ ৪/১১৯ হা. ১৭০৮০ সহীহ)
৬. মাথা, পিঠ ও কোমর সমান রাখা, উঁচ-নিচু না করা। (বুখারী-১/১১৪ হা. ৮২৮ মুসলিম-১/১৯৪ হা. ৪৯৮)
* মহিলাগণ রুকুতে পুরুষদের তুলনায় কম ঝুঁকবে। (মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক ৩/১৩৭ হা. ৫০৬৯ সহীহ)
৭. রুকুতে কমপক্ষে তিনবার রুকুর তাসবীহ (সুবহানা রাব্বিয়াল 'আযীম) পড়া। (আবু দাউদ-১/১২৯ হা. ৮৮৬ সহীহে ইবনে খুজায়মা ১/৩৩৪ হা. ৬৬৮ হাসান লিগাইরিহী)
৮. রুকু হতে ওঠার সময় ইমাম 'সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ্ এবং মুক্তাদী 'রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদ' এবং একাকী নামায আদায়কারী উভয়টি বলা। (বুখারী-১/১০১ হা. ৭৩৩,৭৮৯)
বি.দ্র. রুকু থেকে উঠে সম্পূর্ণ সোজা হয়ে এক তাসবীহ পরিমাণ স্থিরভাবে দাঁড়ানো জরুরি। (বুখারী -১/১১০ হা. ৮০১,৮০২)

নামাযে সিজদার সুন্নাত ১২টি

১. তাকবীর বলা অবস্থায় সিজদায় যাওয়া। (বুখারী ১/১১০ হা. ৮০৩)
(সিজদায় যাওয়া ও সিজদা হতে দাঁড়ানোর সময় তাকবীর এক আলিফ থেকে অধিক টানা উচিত নয়। অবশ্য হদর এবং তারতীলের পার্থক্য থাকবে।) (শামী- ১ : ৪৮০)
২. প্রথমে উভয় হাঁটু মাটিতে রাখা। (নাসাঈ ২/২০৬ হা. ১০৮৯, আবু দাউদ১/১২২ হা. ৮৩৮ সহীহ লিগাইরিহী)
৩. তারপর (হাঁটু থেকে আনুমানিক এক হাত সামনে) উভয় হাত রাখা এবং হাতের আঙুলসমূহ কিবলামুখী করে সম্পূর্ণরূপে মিলিয়ে রাখা। (বুখারী ১/১১৪ হা. ৮২৮, সহীহে ইবনে খুজায়মা ১/৩২৪ হা. ৬৪২, ৬৪৩ হাসান)
* মহিলাগণ অত্যন্ত জড়সড় ও সংকুচিত হয়ে সিজদা করবে। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ১/২৪২ হা. ২৭৭৭ সহীহ)
৪. তারপর উভয় বৃদ্ধাঙ্গুলির মাথা বরাবর নাক রাখা। (মুসনাদে আহমাদ-৪/৩১৮ হা. ১৮৮৯৪ সহীহ)
৫. তারপর কপাল রাখা। (মুসনাদে আহমদ-৪/৩১৭ হা. ১৮৮৮০ সহীহ)
৬. অতঃপর দুই হাতের মাঝে সিজদা করা এবং দৃষ্টি নাকের অগ্রভাগের দিকে রাখা। (মুসলিম-১/১৭৩ হা. ৪০১/ মুস্তাদরাকে হাকেম ১/৪৭৯ হা. ১৭৬১ সহীহ)
৭. সিজদায় পেট উরু থেকে পৃথক রাখা। (মুসলিম ১/১৯৪, হা. ৪৯৬, আবু দাউদ- ১/১০৭ হা. ৭৩৫ হাসান)
* মহিলাগণ উভয় রানের সঙ্গে পেট মিলিয়ে রাখবে। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ১/২৪২ হা. ২৭৭৭ সহীহ)
৮. পাঁজরদ্বয় থেকে উভয় বাহু পৃথক রাখা। (বুখারী ১/১১২ হাঃ ৮০৭)
* মহিলাগণ বাহুদ্বয় যথাসাধ্য পাঁজরের সাথে মিলিয়ে রাখবে। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ১/১৩৮ হা. ২৭৮১ সহীহ।)
৯. কনুই মাটি ও হাঁটু থেকে পৃথক রাখা। (বুখারী ১/১১৩ হা. ৮২২)
* মহিলাগণ কনুই মাটিতে মিলিয়ে রাখবে এবং পায়ের পাতাগুলো দাঁড়ানো না রেখে (ডান দিকে বের করে) মাটিতে বিছিয়ে রাখবে আর আঙুলগুলো যথাসাধ্য কিবলামুখী রাখবে। (মারাসীলে আবী দাউদ ১১৯ হা. ৮৭ সহীহ)
১০. সিজদায় কমপক্ষে তিনবার সিজদার তাসবীহ (সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা) পড়া। (আবু দাউদ ১/৫৪২ হা. ৮৭০ হাসান)
১১. তাকবীর বলা অবস্থায় সিজদা হতে ওঠা। (বুখারী-১/১১৪ হা. ৮২৫)
১২. প্রথমে কপাল, (তারপর নাক) তারপর উভয় হাত, তারপর উভয় হাঁটু উঠানো। (মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক-২/১৭৭ হা. ২৯৫৮ সহীহ)
বি.দ্র. দাঁড়ানো অবস্থা থেকে সিজদায় যাওয়ার সময় হাঁটু মাটিতে লাগার আগ পর্যন্ত বুক সম্পূর্ণ সোজা রাখা জরুরি। অপারগতা ছাড়া বুক ঝুঁকিয়ে সিজদায় গেলে একাধিক রুকু হয়ে সুন্নাতের খেলাফ হবে। দু'সিজদার মাঝে সম্পূর্ণ সোজা হয়ে এক তাসবীহ পরিমাণ স্থির হয়ে বসা জরুরি। (সাহাবাগণের আমল থেকে উদ্ধৃত)

নামাযে বসার সুন্নাত ১৩টি

১. বাম পা বিছিয়ে তার ওপর বসা। ডান পা সোজাভাবে দাঁড়িয়ে রাখা। উভয় পায়ের আঙুলসমূহ সাধ্যমতো কিবলার দিকে মুড়িয়ে রাখা। (বুখারী-১/১১৪, হা. ৮২৭, মুসলিম ১/১৯৪,১৯৫ হা. ৪৯৮)
* মহিলাগণ বাম নিতম্বের ওপর বসবে এবং উভয় পা ডান দিকে বের করে কিবলামুখী করত মাটিতে বিছিয়ে রাখবে। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা-১/২৭১ হা.২৮০৮, মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক-৩/১৩৯ হা.

৫০৭৫ সহীহ)
২. উভয় হাত রানের ওপর হাঁটু বরাবর করে রাখা এবং দৃষ্টি দুই হাঁটুর মাঝ বরাবর রাখা। (মুসলিম-১/২১৬ হা. ৫৮০, আবু দাউদ- ১/১৪২, হা. ৯৯০)
পুরুষগণ হাতের আঙুলগুলো স্বাভাবিকভাবে রাখবে।
* মহিলাগণ মিলিয়ে রাখবে। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা-১/২৭০ হা. ২৭৯৪ সহীহ।
৩. 'আশ্হাদু' বলার সঙ্গে সঙ্গে মধ্যমা ও বৃদ্ধাঙ্গুলির মাথা এক সাথে মিলিয়ে গোলাকার বৃত্ত বানানো এবং অনামিকা ও কনিষ্ঠাঙ্গুলিদ্বয় মুড়িয়ে রাখা এবং ('লা-ইলাহা' বলার সময় শাহাদাত আঙুল সামান্য উঁচু করে ইশারা করা। অতঃপর 'ইল্লাল্লাহু' বলার সময় আঙুলের মাথা সামান্য ঝুঁকানো। হাঁটুর সাথে না লাগানো।) (আবু দাউদ-১/১০৫ হা. ৭২৬ সহীহ, নাসাঈ- হা. ১২৭৩ হাসান)
৪. আখেরী বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতু পড়ার পর দরূদ শরীফ পাঠ করা। (বুখারী ১/৪৭৭, হা. ৩৩৭০, তিরমিযী- ২/১৮৬ হা. ৩৪৭৭)
৫. দরূদ শরীফের পর দু'আয়ে মাছুরা পড়া। (বুখারী- ১/১১৫ হা. ৮৩৪/ তিরমিযী- ১/১৩০ হা. ৫৯৩)
৬. উভয় দিকে সালাম ফিরানো। (মুসলিম ১/১৮১, হা. ৫৮২, তিরমিযী ১/৬৫ হা. ২৯৫)
৭. ডান দিকে আগে সালাম ফিরানো। উভয় সালাম কিবলার দিক থেকে আরম্ভ করা এবং সালামের সময় দৃষ্টি কাঁধের দিকে রাখা। (মুসলিম ১/২১৬ হা. ৫৮২, তিরমিযী ১/৬৬ হা. ২৯৬)
৮. ইমাম উভয় সালামে মুক্তাদী, ফেরেশতা ও নামাযী জ্বিনদের প্রতি সালাম করার নিয়ত করা। (মুসলিম ১/১৮১ হা. ৪৩১, মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক ২/২২২ হা. ৩১৪১ সহীহ)
৯. মুক্তাদীগণ উভয় সালামে ইমাম, অন্যান্য মুসল্লী, ফেরেশতা ও নামাযী জ্বিনদের প্রতি সালাম করার নিয়ত করা। (মুসলিম ১/১৮১ হা. ৪৩১, ইবনে মাজাহ ১/৬৫, ৬৬ হা. ৯২২, সহীহ মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক ২/২২৩, ২২৪ হা. ৩১৪৯, ৩১৫২ সহীহ)
১০. একাকী নামাযী ব্যক্তি শুধু ফেরেশতাগণের প্রতি সালাম করার নিয়ত করা। (মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক ২/২২১ হা. ৩১৪০ সহীহ)
১১. মুক্তাদীগণ ইমামের সালাম ফিরানোর সাথে সাথে অবিলম্বে সালাম ফিরানো। (বুখারী ১/১১৬ হা. ৮৩৮)
১২. ইমাম সালাম ফিরানোর সময় দ্বিতীয় সালাম প্রথম সালাম অপেক্ষা আস্তে বলা এবং প্রথম সালাম অপেক্ষা দ্বিতীয় সালামে মদ কম করা। (তিরমিযী ১/৬৬ হা. ২৯৭, মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবাহ ১/৩০০ হা. ৩০৫৭ সহীহ)
১৩. ইমামের দ্বিতীয় সালাম ফিরানো শেষ হলে মাসবূকের ছুটে যাওয়া নামায আদায়ের জন্য দাঁড়ানো। (মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক ২/২২৫ হা. ৩১৫৬ সহীহ)

মুনাজাত ও দু'আর সুন্নাতসমূহ

১. উযুর সাথে কিবলামুখী হয়ে দু'আ করা। দু'আর শুরুতে আল্লাহর প্রশংসা করা এবং নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ওপর দরূদ শরীফ পাঠ করা। (বুখারী ২/৯৪৪ হা. ৬৩৮৩, ২/৯৩৯ হা. ৬৩৪৩, আবু দাউদ ১/২০৮ হা. ১৪৮১, তিরমিযী ২/১৮৬ হা. ৩৪৭৭ সহীহ)
২. উভয় হাত বুক বরাবর রাখা। (মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক-২/২৪৭ হা. ৩২৩৪ সহীহ)
৩. হাতের তালু আসমানের দিকে প্রশস্ত করে রাখা। (তাবরানী কাবীর ৪/১৩৭ হা. ৩৮৪২ হাসান)
৪. হাতের আঙুলসমূহ স্বাভাবিক ফাঁকা রাখা। (মুস্তাদরাকে হাকেম ১/৫১৬ হা. ১৮৯৯ সহীহ)
৫. দু'হাতের মাঝখানে সামান্য ফাঁকা রাখা। (মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক ২/২৫১, হা. ৩২৪৯, সহীহ)
৬. মন দিয়ে আকুতি-মিনতি সহকারে দু'আ করা। (সূরা আ'রাফ আয়াত ৫৫, ২০৫)
৭. আল্লাহর নিকট দু'আর বিষয়টি বিশ্বাস ও দৃঢ়তার সাথে বারবার চাওয়া। (বুখারী ২/৯৩৮ হা. ৬৩৩৮, মুসলিম- ২/৩৪২ হা. ৬৬৭৮)
৮. ইখলাসের সাথে নিঃশব্দে দু'আ করা মুস্তাহাব। (সূরা আ'রাফ, ৫৫,২০৫, বুখারী ১/৪২০ হা. ২৯৯২)
৯. আল্লাহ পাকের প্রশংসা এবং রাসূল (সা.)-এর ওপর দরূদ-সালাম ও 'আমীন' বলে দু'আ শেষ করা। (সূরায়ে ইউনুস, আয়াত ১০ মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক-২/২১৬ হা. ৩১১৭ হাদীস গ্রহণযোগ্য, আবু দাউদ-১/১৩৫ হা. ৯৩৮ হাসান)
১০. মুনাজাতের পর হস্তদ্বয় দ্বারা মুখমণ্ডল মুছে নেয়া। (আবু দাউদ-২/১৬৩,১৬৪ হা. ১৪৮৫, ১৪৯২ হাসান)

বি.দ্র. হাদীসের উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে ভারত বর্ষে প্রচলিত প্রকাশনা অনুযায়ী খণ্ড ও পৃষ্ঠা নাম্বার উল্লেখ করা হয়েছে।

তুরাগ তীরে বিশ্ববাসীর ইজতিমা

মুফতী শরীফুল আজম

ইসলাম বিশ্ববাসীর সুখ-শান্তি আর সফলতার একমাত্র খোদায়ী নেজাম। যেখানে জাত-পাত, বর্ণবাদ বা গোত্রের কোনো ভেদাভেদ নেই। নেই কোনো ভৌগলিক সীমাবদ্ধতা। প্রতি বছর বিশ্ব ইজতিমা এ মহাসত্যটি স্মরণ করিয়ে দেয় বিশ্ববাসীকে। বিশ্ব ঐক্যের প্রতীক তুরাগ পাড়ের এই বিশ্ব ইজতিমার সূচনা হয়েছিল ছোট্ট পরিসরে খুলনার মোল্লারহাট থানাধীন উদয়পুর গ্রামে। প্রচলিত দাওয়াত ও তাবলীগের একেবারে সূচনালগ্নের কথা। সবেমাত্র হযরতজী মাও. ইলিয়াস (রহ.) মেওয়াতের গ্রাম্য এলাকায় এ কাজ আরম্ভ করেছেন। খুব বেশি শোহরত তখনো হয়ে ওঠেনি। এমন সময় মুজাহিদে আযম আল্লামা শামসুল হক্ব ফরিদপুরী (রহ.) ইলমে জাহেরী ও ইলমে বাতেনীর বুৎপত্তি অর্জন শেষে ভারত থেকে দেশে ফেরার প্রস্তুতি নিলেন। পথে দাওয়াত ও তাবলীগের গোড়াপত্তনকারী হযরতজী হযরত মাও. ইলিয়াস (রহ.)-এর সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশে দিল্লির নিযামুদ্দীন মারকাযে গিয়ে উঠলেন। হযরতজী তাকে পেয়ে যারপরনাই খুশি হলেন। বুকে জড়িয়ে আলিঙ্গন করলেন। অনেক দু'আ দিলেন এবং বললেন, তোমাকে নিজ দেশে তাবলীগের দায়িত্ব নিতে হবে। হযরত মাওলানা শামসুল হক্ব ফরিদপুরী (রহ.) এতে সম্মতি জ্ঞাপন করলেন। বিদায় নিয়ে ফিরে এলেন দেশে।

দেশে ফেরার পর দ্বীনের নানা কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ার পাশাপাশি তাবলীগের কাজ সূচনা করার অপেক্ষায় রইলেন। এর জন্য সন্ধান করতে লাগলেন একজন মুখলিস মানুষের। যাকে এই মেহনতের জিম্মাদারী অর্পণ করা যায়। তৎকালীন খুলনার মোল্লারহাট থানার উদয়পুরের প্রসিদ্ধ পীর হযরত মাওলানা আব্দুল হালীম সাহেব (রহ.)-এর বাড়িতে ছিল এক বিশাল মাদরাসা। একদিন হযরত ফরিদপুরী (রহ.) তাঁর মাদরাসা দেখতে উদয়পুর গেলেন। হঠাৎ তাঁর অনুসন্ধানী দৃষ্টি পড়ল এক যুবক আলেমের ওপর। বয়স ২৫/২৬ হবে। উজ্জ্বল চেহারা, বিশাল দেহ। নূরে ঝলমল করছে তাঁর আপাদমস্তক। এক নজরেই যেন তিনি অনেক কিছু বুঝে ফেললেন। বহু প্রতীক্ষিত রত্ন যেন আজ তিনি হাতে পেয়ে গেছেন। কাছে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, বাবা! তুমি এখানে কী করো? মাওলানা বললেন, হুজুর আমি এই মাদরাসার শিক্ষক। পীর সাহেবের জামাতা। (তিনি ছিলেন পরবর্তীর তাবলীগের মুরব্বি মাও. আব্দুল আজিজ রহ.) হযরত ফরিদপুরী (রহ.) বললেন, তুমি আমার সাথে চলো, শিক্ষকতা থাক। অতঃপর পীর সাহেবের সাথে দীর্ঘ পরামর্শ করে তাঁকে কলকাতা মারকাযে পাঠিয়ে দিলেন। তারপর দিল্লির নিযামুদ্দীন ও মেওয়াতে পাঠালেন। মাও. ইউসুফ সাহেব (রহ.)-এর সান্নিধ্যে থেকে তাবলীগের কাজটি পরিপূর্ণভাবে শিখে দেশে ফিরে এলেন।

এবার বাংলার জমিনে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ শুরু করতে হবে। আল্লামা শামসুল হক্ব ফরিদপুরী (রহ.)-এর পরামর্শে মাও. আব্দুল আজিজ (রহ.) আমির মনোনীত হলেন। উদয়পুর মাদরাসা মসজিদকে মারকায বানানো হলো। এটা ছিল এ দেশের মাটিতে সর্বপ্রথম তাবলীগী মারকায। এখানেই অনুষ্ঠিত হয় সর্বপ্রথম ইজতিমা। এরপর কাজের পরিধি দিন দিন বাড়তে থাকলে স্থান সংকুলান না হওয়ায় দ্বিতীয় মারকায নির্ধারিত হয় মাও. আব্দুল আজিজ (রহ.)-এর গ্রামের বাজার মসজিদটিতে। এটা খুলনার তেরখাদা বামন ডাঙ্গায় অবস্থিত। ৪/৫ বছর এখান থেকে তাবলীগের কাজ হতে লাগল এবং প্রসার হতে লাগল। তখন ইজতিমা এই মারকাযেই অনুষ্ঠিত হতো। একবার ইজতিমায় হযরত ফরিদপুরী (রহ.) বললেন, বাবা আব্দুল আজিজ! গ্রামে মারকায হয় না। মারকায খুলনা শহরে নেয়া দরকার। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শহরের হেলাতলার তালাবওয়ালী মসজিদ বর্তমান দারুল উলুম মাদরাসার মসজিদে তৃতীয় মারকায স্থাপিত হলো। কাজ জোরেশোরে আরম্ভ হলো। মাও. আব্দুল আজিজ (রহ.) সর্বদা মারকাযে অবস্থান করে সার্বিক দিকনির্দেশনা দেন। বেশ কয়েক বছর কেটে গেল। ইজতিমা অনুষ্ঠিত হতে থাকল। একবার ইজতিমার পর হযরত ফরিদপুরী (রহ.) বললেন, বাবা আব্দুল আজিজ! দেহ এক জায়গায় আর রূহ আরেক জায়গায়-কাজে বরকত হচেছ না। এখানে আঞ্চলিক মারকায থাক। তুমি ঢাকার লালবাগ শাহী মসজিদে চলে এসো। শাহী মসজিদ বাংলাদেশের মারকায হবে। সিদ্ধান্ত মোতাবেক চতুর্থ মারকায হলো লালবাগ শাহী মসজিদে। কিছুদিন চলার পর লালবাগে ইজতিমার জন্য জায়গা সংকুলান হলো না। হযরত মাওলানা ফরিদপুরী (রহ.) বললেন, দেখো, মসজিদের সাথে মাঠ কোথায় আছে। অদূরেই ছিল খান মুহাম্মদ মসজিদ। লালবাগ কেল্লার উত্তর-পশ্চিম দিকে ওই মসজিদের পাশেই ছিল একটি খোলা মাঠ। পরামর্শ করে সেখানে স্থাপন করা হলো পঞ্চম মারকায।

কয়েক বছর পর খান মুহাম্মদ মসজিদ মাঠেও ইজতিমার জায়গা সংকুলন হলো না। পরামর্শ হলো কী করা যায়? হযরত ফরিদপুরী সাহেব (রহ.) সবাইকে বললেন, আপনারা দেখুন ঢাকা শহরে বড় মাঠের পার্শ্বে কোথাও কোনো মসজিদ আছে কি না? অনেক অনুসন্ধানের পর পাওয়া গেল এমন একটি মসজিদ। রমনা পার্কের বিশাল মাঠের পাশে ছোট্ট একটি মসজিদ। মালওয়ালী মসজিদ। মসজিদটি একেবারে ছোট।

ফরিদপুরী (রহ.) বললেন, মসজিদ ছোট হোক তাতে কোনো অসুবিধা নেই। প্রয়োজনে পার্কের জায়গা নিয়ে মসজিদ বড় করা যাবে। পরামর্শ শেষে মালওয়ালী মসজিদে স্থাপন করা হলো ষষ্ঠ মারকায। ছয় নম্বরের মেহনতের ষষ্ঠ মারকাযকেই আল্লাহ তা'আলা বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় মারকায হিসেবে কবুল করলেন। দীর্ঘদিন যাবৎ রমনা পার্কেই ইজতিমার আয়োজন হতে থাকে। দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ ইত্যিবসরে বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েছে। দিন দিন লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। বড় পরিসরে আয়োজনের উদ্দেশে ইজতিমা স্থানান্তরিত হয় টঙ্গীতে, তুরাগ নদীর তীরে।

জায়গা সংকুলান না হওয়াতে আবার দুই পর্বে আয়োজন শুরু হয় বিশ্ব ইজতিমার। তবুও লোকের কোনো কমতি নেই। মূল শামিয়ানায় স্থান না পেয়ে অসংখ্য লোকদের খোলা আকাশের নিচে বা পলিথিনের ছাউনি দিয়ে অবস্থান করতে দেখা যায়। লাখ লাখ লোক। কত লাখ কেউ সঠিক বলতে পারবে না। অনুমান করে না বলাই ভালো। শতাধিক দেশের অতিথিদের আগমন ঘটেছে এবারের বিশ্ব ইজতিমায়। এ যেন বিশ্ববাসীর এক ঈমানী মিলনমেলা। কৃষ্ণাঙ্গ-শ্বেতাঙ্গ আর সমাজের উঁচু-নিচু সব মিলেমিশে একাকার টঙ্গীর তুরাগ পাড়ে। বর্ণ, গোত্র আর জাতীয়তার বাঁধ ভেঙে সকলেই যেন ঘোষণা করছে মোরা এক উম্মত। মুসলমান মুসলমানের ভাই ভাই। ভিন্ন ভাষাভাষী হওয়া সত্ত্বেও একে অপরের মনের কথা বুঝতে কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। এমন বৈচিত্র্যের মাঝে ঐক্যের রেখা টেনে দেয়া সম্ভব হয়েছে একমাত্র ইসলামের মাধুর্যতার কারণে। ইসলামই পারে গোটা বিশ্ববাসীকে এক কাতারে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড় করাতে। এক রবের সম্মুখে মস্তক ঝুঁকাতে। দুহাত পেতে সমস্বরে আমীন বলাতে। একসাথে বসে অশ্রু ঝরাতে।

ইসলাম তো এসেছে বিশ্ববাসীর কল্যাণ সাধনের বার্তা নিয়ে। ইসলামের সামগ্রিকতা ও উদারতার ফলে বিশ্বের সকল দেশের সকল মানুষের জন্য তা পালন সহজ, সহনীয় ও প্রশান্তিদায়ক। তাই এর প্রতি বিশ্ববাসীর এত ঝোঁক। ইসলাম কোনো অঞ্চল দেশ বা জাতির মাঝে সীমাবদ্ধ নয় বরং ইসলাম বিশ্ববাসীর ধর্ম মানবতার ধর্ম।

সীমাবদ্ধ তাবলীগ :

ইসলামপূর্ব ধর্মসমূহ অঞ্চল, দেশ বা গোত্রের মাঝে সীমাবদ্ধ ছিল। গোটা বিশ্ববাসীর জন্য প্রযোজ্য ছিল না। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে

وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ

"এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য পথপ্রদর্শক রয়েছে।" (সূরা রা'দ-৭) তাই তাদের তাবলীগ স্বীয় গোত্রের মাঝে সীমাবদ্ধ ছিল।

যেমন হযরত নূহ (আ.) সম্পর্কে বলা হয়েছে– لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ

"নিশ্চয় আমি নূহকে তার সম্প্রদায়ের প্রতি পাঠিয়েছি।" (সূরা আ'রাফ-৫৯)

হযরত সালেহ (আ.) সম্পর্কে বলা হয়েছে-

وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا

"সামূদ সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করেছি তাদের ভাই সালেহকে।" (সূরা আ'রাফ-৭৩)

হযরত শোয়াইব (আ.) সম্পর্কে বলা হয়েছে-

وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا

"আমি মাদইয়ানের প্রতি তাদের ভাই শোয়াইবকে প্রেরণ করেছি।" (সূরা আ'রাফ-৮৫)

হযরত মূসা (আ.) ও তাঁর আনীত কিতাব সম্পর্কে বলা হয়েছে-

وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ

"আমি মূসা (আ.) কে কিতাব দিয়েছি এবং সেটিকে বনী ইসরাঈলে জন্য হেদায়েতে পরিণত করেছি।" (সূরা বনী ইসরাঈল-২)

হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে বলা হয়েছে-

وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ

"আর বনী ইসরাঈলদের জন্য রাসূল হিসেবে তাকে মনোনীত করে। (সূরা আলে ইমরান-৪৯)

অতএব, এ সকল ধর্মে গোটা বিশ্ববাসীর জন্য সর্বজনীন পাথেয় থাকতে পারে না। সকলের জন্য প্রযোজ্যও হতে পারে না। যদি খোদায়ী এই সিদ্ধান্ত উপেক্ষা করে গোটা দুনিয়ায় এ সকল ধর্ম প্রচারের চেষ্টা করা হয় তবে সেটা হবে নিষ্ফল এক কসরত। এতে হয়তো ওই ধর্মের অনুসারীদের কাছে নিজের ধর্ম অসম্পূর্ণ মনে হবে। ফলে তারা হিনমন্যতায় ভুগতে থাকবে এবং নতুন এমন কোনো ধর্মের সন্ধানে নামবে যা বিশ্বময় চলতে পারে। খ্রিস্ট জগতের বর্তমান সময়ে ইসলামের প্রতি সর্বাধিক ঝুঁকে পড়ার অন্যতম কারণ এটি। অথবা তারা ধর্মকে ব্যক্তিগত জীবনের গণ্ডিতে পালনীয় ঐচ্ছিক কোনো বস্তু মনে করবে। সমাজ, দেশ বা বিশ্বময় এর পরিপালন কাল্পনিক মনে হবে। ফলে রাষ্ট্রীয় জীবনে ধর্মকে উপেক্ষা করা

হবে। এ কারণে বর্তমান বিশ্বে ইসলাম ছাড়া বাকি সব ধর্মের লোকদের মাঝে একটি কথা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে যে, ধর্ম রাজনীতি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা একটি ব্যক্তিগত বিষয়। বিশেষ করে খ্রিস্ট জগতে এই প্রবাদ বাক্য প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে যে, পাদ্রিকে দাও পাদ্রির অধিকার আর বাদশাহকে দাও বাদশার অধিকার। বোঝা গেল এ সকল ধর্ম সামগ্রিক নয়। জীবনের সকল ক্ষেত্রে বিশ্ববাসীকে পথ দেখাতে অপারগ।

বিশ্ববাসীর তরে :

পক্ষান্তরে ইসলাম হচ্ছে একটি পূর্ণাঙ্গ ধর্ম। সব মানুষের সকল চাহিদা পূরণ করতে রয়েছে এর স্বচ্ছ ও সফল বিধি-বিধান। বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়া ও পরিপালিত হওয়ার সক্ষমতা রয়েছে এতে। এর কোনো নির্দিষ্ট পরিধি বা পরিসীমা নেই। কিয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীর প্রতি ইঞ্চি ইঞ্চিতে সহজেই এর বাস্তবায়ন সম্ভব। তাই এর তাবলীগ বা প্রচরণা চলবে বিশ্বময়। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে-

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا

"বলে দাও হে মানবমণ্ডলী! তোমাদের সবার প্রতি আমি আল্লাহর প্রেরিত রাসূল। (সূরা আ'রাফ-১৫৮)

নবীজি মুহাম্মদ (সা.) ইরশাদ করেন–

كان النبى يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس كافة

"পূর্বের নবীগণকে শুধু নিজ সম্প্রদায়ের জন্য পাঠানো হতো, আর আমাকে সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য পাঠানো হয়েছে।

অপর হাদীসে ইরশাদ হয়েছে-

ان مثل ما بعثنى الله به من الهدى والعلم كمثل غيث اصاب ارضا ---

নবীজি (সা.) বলেন, আমাকে আল্লাহ তা'আলা যে হেদায়েত এবং ইলম দিয়ে পাঠিয়েছেন তার দৃষ্টান্ত জমিতে বর্ষিত বৃষ্টির ন্যায়। (বুখারী, মুসলিম)

এখানে ইসলামকে পানির সাথে তুলনা করা হয়েছে। পানি যেমন সকলের জন্য জরুরি তদ্রূপ ইসলামও জরুরি। পানি ছাড়া যেমন কেউ বাঁচতে পারে না, ইসলাম ছাড়াও জীবনের প্রকৃত স্বাদ কেউ পেতে পারে না। পৃথিবীর যেকোনো ভূখণ্ডে বাস করা হোক আর যেকোনো জ্ঞান বিজ্ঞানে পণ্ডিত্য অর্জন করা হোক না কেন কেহ পানির অপরিহার্যতা অস্বীকার করতে পারবে না, তদ্রূপ নিরপেক্ষ ও ইনসাফের দৃষ্টিতে বিচার করলে ইসলামের অপরিহার্যতা মেনে নিতে বাধ্য হবে। কারণ ইসলাম সে তো মানবতার ধর্ম, জীবন সঞ্চারনের ধর্ম। তাই বিশ্ববাসীর এত ঝোঁক ইসলামের প্রতি, বিশ্ব ইজতিমার প্রতি।

নামের মাঝে ব্যপকতা :

ইসলাম ছাড়া অন্য সব ধর্মের নামকরণ করা হয়েছে কোনো ব্যক্তি, গোত্র বা দেশের নামে। যা মূলত তার সংকীর্ণতাকেই ফুটিয়ে তুলেছে। যেমন হিন্দু ধর্মের নাম দেশের সাথে মিলিয়ে রাখা হয়েছে। ইহুদী ধর্ম গোত্রের নামে এবং খ্রিস্টান ও বৌদ্ধ ধর্ম ব্যক্তির নামে নামকরণ হয়েছে। পক্ষান্তরে ইসলাম শব্দটির সাথে কোনো দেশ বা জাতির সম্পর্ক নেই। তদ্রূপ ইসলামের অপর গুণবাচক নামগুলোর অবস্থাও তাই। যেমন-

سبيل رب، صراط مستقيم، صراط الله، هداية ، حنيفا

পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে উল্লিখিত সাবিলি রবব, সীরাতে মুসতাকীম, সীরাতিল্লাহ, হেদায়েত ও হানীফা ইত্যাদি শব্দগুলো বিশ্ববাসীকে জানান দিচ্ছে যে, ইসলাম কোনো দেশ বা ভূখণ্ডের পৈত্রিক সম্পত্তি নয় বা কোনো গোত্র বিশেষের জাগিরদারীও নয়। অথবা ব্যক্তিপূজা তার লক্ষ্য নয়। দেশ, গোত্র, জাতপাত ও বর্ণবাদের উর্ধ্বে মানবতার সামগ্রিক কল্যাণের ধর্ম হচ্ছে ইসলাম। বিশ্ববাসীর ধর্ম ইসলাম।

বিস্তৃত গণ্ডি :

ইসলাম নামটি যেমন ব্যাপকতার দাবি রাখে এর বিচরণভূমিও তেমন বিস্তৃত। গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ার মতো সক্ষমতা থাকায় এতে এমন সব বিধিবিধান রয়েছে, যার ফলে যেকোনো স্থানে ইসলাম পরিপালন সহজ হয়ে যায়। নবীজি (সা.) বলেন-

جعلت لى الارض مسجدا وطهورا

"গোটা ভূমণ্ডলকে আমার জন্য মসজিদ এবং পবিত্রতার উপকরণ বানিয়ে দেয়া হয়েছে।" (ইবনে মাজাহ)

ব্যাপক সক্ষমতা :

বিশ্ববাসীর দ্বারে দ্বারে সকল দেশে দেশে পৌঁছে যাওয়ার যে ব্যাপক সক্ষমতা ইসলামের রয়েছে তা ফুটে উঠেছে একটি হাদীস থেকে। নবীজি (সা.) বলেন-

لايبقى على ظهر الارض بيت مدر ولا وبر الا ادخله الله كلمة الاسلام بعز عزيز وذل ذليل۔

"ভূপৃষ্ঠে অবস্থিত সকল কাঁচা-পাকা গৃহে আল্লাহ তা'আলা ইসলামকে প্রবেশ করাবেন, সম্মানের সাথে হোক বা অপদস্থ করে।" (মিশকাত)

অতএব বিশ্বব্যাপী প্রচারিত হওয়ার যোগ্যতা রয়েছে একমাত্র ইসলামের মাঝে। তাই বিশ্ব নবীর আলমী উম্মত পুরো আলমে ইসলামকে পৌঁছে দেয়ার জন্য আলমী মেহনত তথা দাওয়াত ও তাবলীগের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে একত্রিত হচ্ছে প্রতি বছর। বিশ্ববাসীর এই ইজতিমা থেকে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দেয়া হচ্ছে পৃথিবীর আনাচে-কানাচে। এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার বুকে ইসলামের ঝাণ্ডা আবার উড্ডীন করবেন, ইনশাআল্লাহ।

তাসাওফ বনাম প্রাচ্যবিদদের ষড়যন্ত্র

মুফতী শাহেদ রহমানী

মূলত প্রাচ্যবিদদের আন্দোলনের সূচনা হয় তের শতাব্দীর ওই সময়, যখন পুরো খ্রিস্টীয় জগৎ ইসলামের বিরুদ্ধে নিজেদের ক্রুশ যুদ্ধে বারবার পরাজয়ের গ্লানি বহন করছিল। তখন তাদের দার্শনিক ও গবেষকরা এই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হলো যে, বর্তমানে শক্তি সামর্থ্য এবং যুদ্ধ-বিগ্রহের মাধ্যমে ইসলামকে আদর্শগত ও রাজনৈতিকভাবে মোকাবেলা করা সম্ভবপর নয়। অতঃপর তারা যথেষ্ট গবেষণা ও দীর্ঘ চিন্তা-ভাবনার পর এই কর্মপন্থা নির্ধারণ করল যে, বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনায় স্বীয় আক্রমণাত্মক ভূমিকা এবং যুদ্ধপলিসি পরিত্যাগ করে অথবা সাময়িকভাবে স্থগিত রেখে জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং যুক্তি দর্শনের মোড়কে ইসলামী দর্শনকে অসার ও অবাস্তব প্রমাণ করতে হবে এবং অসির পরিবর্তে মসির মাধ্যমে মুসলমানদের কোণঠাসা করতে হবে।

এই হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার লক্ষ্যে ইসলামের আজন্ম শত্রু পশ্চিমা গবেষকরা নিজেদের স্বভাবজাত শঠতা এবং ধূর্ততার মাধ্যমে সুদূরপ্রসারী ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করে। তারা ইহুদী ধর্মজাযক ও খ্রিস্টান মিশনারিদেরকে এ কথার ওপর উদ্বুদ্ধ করল যে, ইউরোপে ইসলামী শিক্ষার নেতিবাচক(?) দিকগুলোর ওপর গবেষণার জন্য স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হোক এবং সেখানে 'রিসার্চ স্কলারস'-এর নামে ধীমান খ্রিস্টান গবেষক এবং ইহুদী ধর্মজাযকদের নিয়োগ দেয়া হোক। তাদের কাজ হবে, ইসলামের মৌলিক উৎস তথা কুরআন, হাদীস এবং অন্যান্য ইসলামী তত্ত্ব-উপাত্ত নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা-পর্যালোচনার পর ইসলামী শিক্ষার আসল আকৃতিকেই বিকৃত করে বিশ্ববাসীর সামনে নতুন গবেষণার মোড়কে প্রবন্ধ-নিবন্ধ এবং গ্রন্থাকারে উপস্থাপন করা। তারা সেখানে এমন কিছু মনগড়া যুক্তি প্রমাণও পেশ করবে, যার মাধ্যমে ইহুদী ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব এবং খ্রিস্টান ধর্মের সত্যতা আপনা আপনিই প্রতিভাসিত হয়ে উঠবে। ফলে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত তরুণ প্রজন্ম স্বীয় দ্বীন সম্পর্কে সংকীর্ণতায় ভুগবে এবং নিজেদের মুসলমান পরিচয় দিতেও লজ্জাবোধ করবে। প্রফেসর অ্যারন্যাল্ডের রচিত "প্রিচিং অব ইসলাম" উল্লিখিত বক্তব্যের স্বপক্ষে অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায়।

দীর্ঘদিন ধরে প্রাচ্যবিদরা কুরআন-হাদীস, সীরাতুন্নবী (সা.), ইসলামী আইনশাস্ত্র, ইসলামের চরিত্র অধ্যায় এবং তাসাওফ (তথা ইহসান)-এর অধ্যয়ন এ উদ্দেশেই করে আসছে, যেন সেখান থেকে ভুল-ত্রুটি বের করে ইসলামকে কলঙ্কিত করতে পারে। তাদের কর্মপদ্ধতি হচ্ছে, সর্বপ্রথম তারা ইসলামের বিরুদ্ধে একটি মিথ্যা মতবাদ তৈরি করে নেয়। অতঃপর ওই মতবাদটি প্রমাণ করার জন্য তারীখ, হাদীস, সীরাত এবং ইসলামী ফিকহের অগ্রহণযোগ্য এবং অসমর্থিত যুক্তি প্রমাণ উপস্থাপন করে। সে উদ্দেশ্য সাধনে তারা মিথ্যার পসরা সাজাতে কিংবা শঠতার আশ্রয় নিতেও দ্বিধাবোধ করে না। যে মতটি তাদের উদ্দেশ্য সাধনে সহায়ক হবে, তা তাত্ত্বিক দিক দিয়ে যতই দুর্বল কিংবা সন্দেহযুক্ত হোক না কেন সেটিকে তারা নির্লজ্জতার চরম সীমা অতিক্রম করে এবং চরম প্রবলতার সাথে নির্ভরযোগ্য এবং সমর্থিত বলে চালিয়ে দেয়। কুরআন, হাদীস, তাফসীরশাস্ত্র, ফিকাহশাস্ত্র, কালামশাস্ত্র, সাহাবাচরিত, তাবেঈন, মুজতাহেদীন, জরহ-তা'দীলশাস্ত্র, কুরআন সংকলন, হাদীস সংকলন, হাদীসের প্রামাণ্যতা এবং সূলুকে তরীকতের বড় বড় শায়খ, মোটকথা ইসলামের প্রায় প্রত্যেক বিষয়ের ওপর প্রাচ্যবিদদের বিশাল বিশাল রচনাসম্ভার এবং তাদের স্বঘোষিত গবেষণালব্ধ প্রবন্ধ-নিবন্ধে এত বেশি তথ্য-উপাত্তের সমাহার ঘটেছে, যা একজন সচেতন মুসলমানের অন্তরেও বিভ্রান্তি এবং পূর্ববর্তী ওলামা মাশায়েখ সম্পর্কে খারাপ ধারণা সৃষ্টিতে যথেষ্ট বলে বিবেচিত হবে। সাধারণ মানুষ তো তাদের ষড়যন্ত্রের জালে খুব দ্রুতই আটকা পড়বে। বিশেষ করে যারা ইউনিভার্সিটি, স্কুল-কলেজ অথবা পশ্চিমা বিশ্বে শিক্ষার্জনে রত তরুণ সমাজ তারা প্রাচ্যবিদদের জালে ফেঁসে যায় খুব দ্রুত।

পশ্চিমা গবেষকরা যাদের অধিকাংশই 'ইহুদীবাদের প্রবক্তা' তাসাওফ যা মুলত শরীয়তে মুহাম্মদী (সা.)-এর এক অবিচ্ছেদ্য অংশ ইহসানেরই সমার্থক এর ওপর গবেষণা এবং অনুসন্ধানের নামে দোষ-ত্রুটি খুঁজতে যে অপরিসীম চেষ্টা ও অবিরত সাধনা করেছে তা তাদের তাসাওফের ওপর রচিত গ্রন্থসম্ভার, প্রবন্ধ-নিবন্ধ এবং ইউরোপে তাসাওফের পুরনো, মৌলিক গ্রন্থাবলির প্রচার-প্রসার এবং এর প্রকাশনা থেকে স্পষ্ট প্রতিভাত হয়। নিম্নে তার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা পাঠকদের সামনে তুলে ধরতে আমরা চেষ্টা করব। আর এ কথাও সুস্পষ্ট যে, এই কাজগুলো তারা ইসলামের সেবা করার মন-মানসিকতা নিয়ে করেনি। বরং তাদের সকল প্রচেষ্টা এবং প্রয়াসের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, তাসাওফের ধ্যান-ধারণা এবং ইসলামী শিক্ষায় অনুপ্রবেশ এবং তাসাওফের মাধ্যমে

ইসলামের বিরুদ্ধে স্বীয় ক্রুশ যুদ্ধে বিজয়ী হওয়া। তাসাওফের প্রাচীন এবং দুর্লভ গ্রন্থগুলোর পাণ্ডুলিপি খুঁজে খুঁজে বের করা হচ্ছে এবং অনেক টাকা-পয়সা ব্যয় করে তার প্রচার-প্রসার এবং প্রকাশের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এ সবই তাদের ষড়যন্ত্রেরই অংশ। এ দাবিগুলোর পর্যালোচনা করার লক্ষ্যে আমরা নিম্নে ওই সমস্ত গ্রন্থের একটি তালিকা উপস্থাপন করব, যা হয়তো প্রাচ্যবিদদের হাতেই প্রণীত অথবা তাসাওফের কিছু প্রাচীন মৌলিক গ্রন্থ, যা তাদের সম্পাদনায় ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। তন্মধ্যে কিছু গ্রন্থ ইংরেজি ভাষায়, যা ইতিমধ্যে আন্তর্জাতিক ভাষার স্বীকৃতি পেয়েছে। আবার কিছু গ্রন্থ জার্মান ভাষায়। আবার কিছু গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে ফ্রান্স ভাষায়।

কয়েকটি গ্রন্থ

বইয়ের নাম	লেখক	প্রকাশনা
Preaching of islam (ইসলামের পরিচয়)	Thomas Arnold	Constable & Company Ltd. London (U.K) 1913
Mystics of Islam (ইসলামের সূফীগণ)	Rennold. a, Nicholson.	Oxford Press 1914
Studies in Islamic Mysticism (ইসলামী তাসাওফের মুতালা'আ)	Rennold A, Nicholson	Oxford Press 1921
Mystical Demension of Islam (ইসলামের সূফী সুলভ জযবা)	Schimmel	Chapel Hill, North Carolin a university 1975
Oriental Mysticism (প্রাচ্যের তাসাওফ)	E.H. Palmer	London 1867
Sufism (সূফী মাযহাব)	Arberry A.J.	Allen & Unwin, London 1950 Reprint Harper & Row, Newyork (USA 1970
A, Historical Enquiru Concerning the origin and Development of Sufism (সূফীবাদের গোড়াপত্তন এবং প্রচার-প্রসার একটি ঐতিহাসিক সমীক্ষা)	A.J. Arberry	J.R.A.S. 1906
An Itroduction of sufi Doctrine (সূফিয়ানা আকীদার পরিচয়) এটি MD. Metheson এর ফ্রান্স ভাষায় রচিত বইয়ের ইংরেজি অনুবাদ।	burckard TITUS	London 1968
The Transcendentel Unity of Religions (মাযহাব এবং উন্মত্ততার অস্বাভাবিক স্বৈরাচারী কার্যক্রম) পারস্পরিক আকর্ষণ	Schuor Frith jof Eng. Translation by (Peter Town Send)	London 1953
A, comparative Study of the Philosophical Concepts of Sufism And Taoism	Toshihuko, Izutsu	Tokyo (Japan) 1966-67
Readings from the Mystics ইসলামী তাসাওফের শিক্ষা	Margret Smith	Luzac & Co, London 1972
Asitic Researches	W. Johnes	London 1803

Hindu & Muslim Mysticism হিন্দু এবং মুসলমানের তাসাওফ	R.C. Zaehner	New York (USA0 1969
The Passion of Al - Hallaj	Herbert Mason	Princetion University Press 1982 (4Vol)
Akhbar Al-Hallaj (আখবারুল হাল্লাজ)		
Creative Imagination in the Sufism of Ibne Arabi (তাসাওফে ইবনে আরবীর আবিষ্কার চিন্তাধারা)	Corbin Henry	Princetion University Press 1969
Al-Muhasibi an Early Mystic of Banghdad (আল মুহাসেবী-বাগদাদের শুরুকালের সূফী)	margret Smithp	Philo Press Amsterdam
Rabia, the Mystic and her Fellowsaints in Islam (রাবেয়া সূফিয়া এবং তাঁর হামখেয়াল মুসলমান বন্ধু)	Margret Smith	Philo Press Amsterdam 1928
Ibne Taymiah's Sharah on the Futuh Al Ghaib (আল্লামা ইবনে তাইমিয়ার ফুতুহুল গাইবের ব্যাখ্যাগ্রন্থ)	Michal Thomas	London
Ibne Taymia. A Sufi Of the Qadiria Order (ইবনে তাইমিয়া-কাদেরী যুগের একজন সূফী)	George Makdisi	American Journal of Arabic Studies 1973

Simnani on Wahdat-Al-Wujud in Collecter papers on Islamic Philosophy and Mysticism	Hermann Landolt	Tehran 1971
Shaykh Ahmad Sirhindi, an outline of his thought and history of his Image in the Eyes of prosperity. (শায়খ আহমদ সিরহিন্দীর ধারণা ও চিন্তার বাস্তবায়ন ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ)	Mc gill	Cannada 1971
Studies in Islam in India befors Shah Waliullah (ফরাসি ভাষায় রচিত)	Freeland, abbod	New Delhi (vol 11)
Vorlesungen Uber des Islam (ফরাসি ভাষায় রচিত)	Ignez Goldziher	Paris 1925
Mysticque Musalmane. (ফরাসি ভাষায় রচিত)	Louis Gardet & G.C. Anawati	Paris 1968
Essai Sur les origines du lexique technique de la Mysticque Muslamane (ফরাসি ভাষায় রচিত)	Lois Massigon	Paris 1968

Le Passion de Husayn ibn Mansur Hallaj (ফরাসি ভাষায় রচিত)	Louis Massigon	Paris
Culturgesc, Hichtliche strefz uge auf dem Gebiete des Islam (ফরাসি ভাষায় রচিত)	Alfred Vokramer	Paris 1873
Sufismus sive theologia (জার্মানি ভাষায় রচিত)	Persica Pantheistics	Berlin 1921
Ideen and Gundlinier einer algemeine n geschichte der Mystic (জার্মানি ভাষায় রচিত)		
Sufism	A.J. Arberry	London 1950
Muslim Studies	Ignaz Glodziher	London 1971
The Sufi Orders in Islam	j. Spencer Trimingham	Oxford University Press 1973
The Heritage of Iran	A.J. Arbery	London
Kitabul Lamaa	Edit by R.A Nicholson	Ledon (Hollend) 1914
Encyclopaedia of Religion and Ethics		New York Bol VIII 1955

পশ্চিমা বিশ্বে বসবাসকারী ইসলামের চিরশত্রু ইহুদী-খ্রিস্টানরা আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্ক স্থাপন হওয়ার অন্যতম মাধ্যম ইহসান যা পরবর্তী যুগে তাসাওফ নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করেছে, এর প্রচার-প্রসারে তাদের সব সাধনা যে নিষ্ঠা বা আন্তরিকতা এবং ইসলামের সেবার মানসিকতা নিয়ে হচ্ছে না তা হলফ করেই বলা যায়। দুর্লভ গ্রন্থগুলোর পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করে তা ছাপানোর ব্যবস্থা করা, প্রচার-প্রসার করা, এ সবই হচ্ছে তাদের ষড়যন্ত্রেরই অংশ বিশেষ। এ কথা তো প্রত্যেক সচেতন ও শিক্ষিত লোক জানেন যে, ইসলাম এবং উম্মাহর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটানো, তাদেরকে কলঙ্কিত করার অপপ্রয়াস চালানো, অসত্য এবং অবাস্তব বর্ণনা তাদের দিকে সম্পৃক্ত করা এসব ইহুদীদের স্বভাবজাত চরিত্র। যারা পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যায় ইসরাঈলী মনগড়া বর্ণনার একটি বড় অংশ অনুপ্রবেশ ঘটাতে পারে এবং যারা ইসলামী ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ জামা'আত সাহাবায়ে কেরামের উন্নত চরিত্র এবং অবিস্মরণীয় কীর্তিকে বিকৃত করে ইতিহাসের মোড়কে মানবজাতির সামনে উপস্থাপন করার দুঃসাহস দেখাতে পারে, তাদের কাছে এই আশা করা যে, তারা তাসাওফের মতো একটি শরীয়তের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে তার বাস্তব ও অবিকৃত আকৃতিতে বিশ্ববাসীর সামনে উপস্থাপন করবে–স্রেফ বোকামি ও অজ্ঞতা ছাড়া আর কিছুই নয়। যারা এসব ধারণা লালন করে, তারা মূলত বোকার স্বর্গেই বসবাস করে। তাসাওফের মতো ইসলামের একটি মৌলিক বিষয়ের গ্রন্থাবলি ইউরোপের বিভিন্ন দেশ যথা–আমেরিকা, ইংল্যান্ড এবং হল্যান্ড থেকে প্রকাশ করার ক্ষেত্রে তাদের একটি লক্ষ্য এটিও ছিল যে, ইহুদী খ্রিস্টানরা ক্রুশ যুদ্ধে রণাঙ্গনে যখন বারবার পরাজয়ের গ্লানিবহন করছিল, তখন তারা প্রতিশোধের নতুন কর্মপন্থা নির্ধারণ করে এবং বিভিন্ন স্থানে ইসলামী গবেষণার নামে বিভিন্ন নতুন নতুন প্রতিষ্ঠান খুলে বসে। সেখানে প্রাচ্যবিদ ও ছাত্ররা ইসলামের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলার হীন স্বার্থে নিজেদের মনগড়া এমন কিছু প্রবন্ধ নিবন্ধ ইসলামী গবেষণার মোড়কে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেয়, যা পড়লে সাধারণ মানুষ ইসলামের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হওয়াই স্বাভাবিক। এভাবে প্রাচ্যবিদরা ইসলাম এবং মুসলমানদের কুৎসা রটানো এবং ইসলামের সত্যতাকে চ্যালেঞ্জ করার হীন চক্রান্তে লিপ্ত হয়ে পড়েছে।

প্রাচ্যবিদরা ইসলামের মূল রূপকে বিকৃতি এবং কলঙ্কিত করার জন্য কোন ধরনের হাতুড়ি ব্যবহার করেছেন। তা তাদের রচিত গ্রন্থাবলি থেকে অনুমান করা যায়। উদাহরণস্বরূপ তাসাওফের অন্যতম পুরোধা শাইখ মুহিউদ্দীন ইবনে আরবী

(রহ.) ওয়াহদাতুল ওয়াজূদের যে ব্যাখ্যা করেছিলেন প্রাচ্যবিদরা তা সম্পূর্ণ পরিবর্তন করে দিয়েছেন। প্রসিদ্ধ পশ্চিমা গবেষক নিকলসন স্বীয় গ্রন্থে Studies in islamic (ইসলামী তাসাওফের পর্যালোচনা) ইরানের সুফী আব্দুল করীমের উদ্বৃতি দিয়ে ইবনে আরবীর দর্শনে যে সংযোজন করে তার উদ্দেশ্যও শুধু এই যে, তাসাওফের এই কণ্টকাকীর্ণ রাজপথে উম্মতকে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব এবং সংশয়ে ফেলে নিজেদের কার্যসিদ্ধি করা এবং তাসাওফকে বিকৃত করে মানবজাতির সামনে উপস্থাপন করা। যাতে মানুষ ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে। নিকলসন পুর্বোক্ত গ্রন্থের ১৪৯ নং পৃষ্ঠায় তাসাওফের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন যে, প্রকৃত অর্থে সুফী ওই ব্যক্তি যার নিজস্ব কোনো অস্তিত্ব থাকে না বরং সে খোদার মাঝে জীবিত থাকে। এখানে ধ্বংস হওয়াটা প্রকৃত পক্ষে স্রষ্টার সাথে একীভূত হয়ে যাওয়া। সারাংশ হলো, একজন মুসলিম সুফীর শেষ পরিণাম হচ্ছে খোদা হয়ে যাওয়া এবং খোদার সাথে প্রভুত্বে অংশীদার হয়ে যাওয়া। (নাউজু বিল্লাহ)

অথচ বাস্তবে ইসলামী তাসাওফের মৌলিক উদ্দেশ্য স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির একীভূত হওয়া কিংবা তার প্রভুত্বে অংশীদার হওয়া নয়। তদ্রূপ প্রভুর সাথে তার জাত এবং গুণাগুণে অংশীদারিত্ব এটিও তাসাওফের লক্ষ্য নয়। অথচ ওয়াহদাতুল ওয়াজূদের সহজ এবং সঠিক ব্যাখ্যা হচ্ছে হযরত মুজাদ্দিদে আলফে ছানী (রহ.)-এর ভাষায় ধ্বংস এবং অস্তিত্বের ধ্যান করার অর্থ প্রভুত্বে অংশীদারিত্ব নয়। কেননা, একজন সুফী মুরাকাবার (ধ্যান) সময় নিজেকে স্রষ্টার সাথে একীভূত বলে ধারণা করে। তার এই অবস্থা মানুষের হুবহু স্বপ্নের মতোই। অর্থাৎ এগুলো কিছুই বাস্তব নয়, বরং কল্পনামাত্র। যেমন ধরুন, আপনি স্বপ্ন দেখলেন যে, আপনি দেশের প্রেসিডেন্ট হয়ে গেলেন। এখন আপনিই বলুন, সত্যি সত্যি কি আপনি প্রেসিডেন্ট হয়ে গেলেন? কখনো নয়। তদ্রূপ একজন সুফী যখন মুরাকাবার সময় নিজেকে খোদার সাথে একীভূত দেখে তখন সে বাস্তব অর্থে খোদা হয়ে যায় না। বরং তা তার কল্পনা থেকে বেশি কিছু নয়। (মাকতুবাতে ইমাম রব্বানী খ. ১, ম. ২৬৬, পৃ. ৫৮৯)

তাসাওফের এই পরিভাষাকে হযরত শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.) আরো স্পষ্ট করে বর্ণনা করেছেন। তার ভাষায়, সুফী আল্লাহর প্রেম এবং মুহাব্বতে সর্বদা নিমগ্ন এবং নিজের অস্তিত্বকে ধ্বংস করে তার ধারণা অনুযায়ী সে আল্লাহর অস্তিত্বে এভাবে একীভূত হয়ে যায়, যেমন লোহার টুকরো আগুনে পুড়ে আগুনের মতো লাল ও প্রচণ্ড গরম হয়ে যায়। মনে হয় যেন লোহার টুকরোটিও আগুনে পরিণত হয়ে গেছে। অথচ বাস্তবে লোহাটি কিন্তু আগুন হয়নি। বরং তা পূর্বের মতো লোহাই আছে। ঠিক তদ্রূপ সুফীও আল্লাহর প্রেমের আগুনে জ্বলে থাকে। অথচ তা কিন্তু লোহার মতোই। যা হোক, এসব কিছুই হচ্ছে কাল্পনিক ছায়ামূর্তির মতো কিছু দর্শন, বাস্তবতার সাথে যার দূরবর্তী সম্পর্কও খুঁজে পাওয়া যাবে না। (হামআত পৃ. ৩৬)

সার কথা হলো, প্রাচ্যবিদরা ইসলামের বিরুদ্ধে যেসকল পন্থায় ব্যাপকভাবে কাজ করে যাচ্ছে, তার মধ্যে বিভিন্ন ইসলামী বিষয়ে গবেষণার নামে মুসলিম সমাজে বিভ্রান্ত ছড়ানো অন্যতম। এটি কখনও মুসলমানদের ধর্মীয় জীবনধারার পাথেয় ফিকাহ শাস্ত্রের ব্যাপারে কুৎসা রটিয়ে, কখনও মুসলমানদের ধর্মীয় জীবন যাপনের অবিচল ও নিপূণ পন্থা তাকলীদের বিরুদ্ধে বিভ্রান্ত ছড়িয়ে, কখনও ইসলামের দেওয়া মহান আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপনের শ্বাশত বিধান এহসান তথা তাসাওফকে বিকৃত করে সেখানে কবর পুঁজা, মাজার পুঁজা, ফকীর পুঁজা, গান-বাদ্য-বাজনা, বেপর্দা- বেহায়াপনা ও অশ্লীলতার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে মুসলমানদের ঈমান আমল ধ্বংসের পায়তারা করে যাচ্ছে। বর্তমানে তারা এ কাজ নামধারী কিছু মুসলমান তথাকথিত গবেষকদের দ্বারাও করিয়ে নিচ্ছে সুকৌশলে। হঠাৎ করে কোনো গবেষককে আবির্ভুত হতে দেখা যায় এবং গবেষণার ফল বের হয় কিয়ামত পর্যন্ত মানবতার হেদায়াতের মুর্তপ্রতীক সাহাবায়ে কেরামের প্রতি বিদ্বেষ সৃষ্টির অপপ্রয়াসে ভরপুর। কোনো কোনো গবেষকের গবেষণার ফল প্রকাশিত হয়, পবিত্র হাদীসকে সহীহ-জয়ীফ বলে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর হাদীস সম্পর্কে বিভ্রান্তি সৃষ্টির মাধ্যমে। এভাবে নিকট অতীত থেকে মুসলিম উম্মাহর মাঝে ধর্মীয় আকীদা সংক্রান্ত ফাটল তৈরী, বিভেদ সৃষ্টি হয়েছে এমন যত নতুন থিউরি গবেষণার নামে যা কিছু প্রকাশ পেয়েছে তার অধিকাংশরই যোগসূত্র ওই সকল ইসলাম দুশমন প্রাচ্যবিদদের সাথে গ্রথিত। তাই ধর্মীয় বিষয়ে হঠাৎ কোনো গবেষক স্কলারের আবির্ভাব হলে প্রথমে তার গবেষণাকে ইসলামের সুস্পষ্ট চারটি দলীল যথা কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াসের কষ্টিপাথরে যাচাই করে দেখতে হবে। যাচাই বাছাই না করে যে কোনো ধরনের গবেষণার পেছনে ছুটলে পদচ্যুত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে।

অবলম্বনে : মাহনামা দারুল উলূম, দেওবন্দ, ইউপি, ইন্ডিয়া।

মারকাযে সালানা ইসলাহী ইজতিমা : ব্যতিক্রমধর্মী এক নূরানী আয়োজন

হাফেজ রিদওয়ানুল কাদির উখিয়াভী

যুগে যুগে মহান আল্লাহ অসংখ্য নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। ভাষা-গোত্র-বর্ণ ভিন্ন হলেও সকলের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল এক ও অভিন্ন। সকলেই মিলিত হয়েছিলেন একই মোহনায়। তাদের মাকছাদ ছিল, মানবজাতির ইসলাহ ও সংশোধন। অপবিত্র ও কলুষিত অন্তরাত্মাকে পরিশুদ্ধ ও পরিশীলিত করাই ছিল তাদের জীবনের অভিষ্ট লক্ষ্য। সমস্ত নবী-রাসূল যথাযথভাবে সম্পাদন করেছেন এই গুরুদায়িত্ব। কারো কোনো ত্রুটি প্রদর্শিত হয়নি কোথাও। কেউ এমনটি মনে করলে তার চরম ধৃষ্টতা ও স্পষ্ট গোমরাহী।

রাসূল (সা.)-এর মাধ্যমে নবুওয়াতি ধারার পরিসমাপ্তি ঘটে। এর পরে কোনো নবীর আগমন কিয়ামত পর্যন্ত আর ঘটবে না। যদি কেউ নবুওয়াতের দাবি করে সে মিথ্যুক, দজ্জাল, দুনিয়ার নিকৃষ্টতম কাফের এবং তার অনুসারীরাও। যেহেতু কিয়ামত পর্যন্ত অন্য কোনো নবীর আগমণ অসম্ভব। তাই নবী (সা.)-এর ঘোষণা অনুযায়ী এই পবিত্র দায়িত্ব অর্পিত হয় উম্মতের শ্রেষ্ঠ জামা'আত ওলামায়ে কেরামের স্কন্ধে। নবীদের যোগ্য উত্তরসূরি হিসেবে এই দায়িত্ব ওলামায়ে কেরাম আদায় করে যাচ্ছেন সুচারুরূপে। ওলামায়ে কেরাম কখনো তালীম-তারবিয়াত, দাওয়াত-তাবলীগ, ওয়াজ-নসীহত এবং আরো বিভিন্ন পদ্ধতিতে এই দায়িত্ব আঞ্জাম দিচ্ছেন। এরই ধারাবাহিকতায় বসুন্ধরা খানেকাহে এমদাদিয়া আশরাফিয়া আবরারিয়া প্রতি বছর আয়োজন করে একটি ব্যতিক্রমধর্মী অনুষ্ঠান, 'ইসলাহী ইজতিমা'। শুধু আলেমদের অংশগ্রহণে আয়োজিত এই ব্যতিক্রমধর্মী ইজতিমার একমাত্র উদ্দেশ্য, মানবজাতির ইসলাহ ও সংশোধন। সারা দেশ থেকে অসংখ্য আলেমদের অংশগ্রহণে একটি বিশাল ইজতিমা। কিন্তু নেই কোনো প্রচারণা, ব্যানার, ফেস্টুন। ইসলাহ বা সংশোধনের শুরু এখান থেকেই। প্রচার-যশ-খ্যাতি নয়, আল্লাহভোলা বান্দাকে তার রবের সাথে সম্পর্ক করাই যার মৌলিক উদ্দেশ্য। নিয়ম অনুযায়ী এই ইসলাহী ইজতিমা অনুষ্ঠিত হয় রবিউল আওয়ালের প্রথম বৃহস্পতিবার ও জুমাবার কিন্তু এ বছর ১ তারিখ জুমাবার হওয়ায় প্রথম সপ্তাহে হওয়া সম্ভবপর হয়নি। তাই ১৪৩৫ হিজরীর ইসলাহী ইজতিমা রবিউল আওয়ালের ৭, ৮ তারিখ ও জানুয়ারির ৯, ১০ রোজ বৃহস্পতিবার ও জুমাবার অনুষ্ঠিত হয়। বৃহস্পতিবারের আগে মেহমানদের আসা আরম্ভ হয়। এদিকে তখন দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছিল খুবই উত্তপ্ত। টানা হরতাল ও লাগাতার অবরোধ চলছিল সারা দেশে। সবার মনে শঙ্কা ও প্রশ্ন, উত্তরাঞ্চল, দক্ষিণাঞ্চল, চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আলেমরা আসবেন কিভাবে? অনেকের প্রস্তাব ছিল, দেশের সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় এ বছরের ইজতিমা স্থগিত করা হোক। কিন্তু হযরত ফকীহুল মিল্লাত দা.বা. ছিলেন অনড় ও অবিচল-ইজতিমা হবে। হযরতের ঈমানী জযবা ও আল্লাহর ওপর অগাধ বিশ্বাস ছিল দেখার মতো। হযরতের দৃষ্টি ছিল হালত বা পরিস্থিতির ওপর নয়, বরং যিনি হালত বা পরিস্থিতির স্রষ্টা, তার ওপর। তিনি চাইলেই তো পারেন পরিস্থিতি শান্ত করতে, অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে। একটি পবিত্র কাজের সিলসিলা, কেন বন্ধ হবে? আল্লাহর ওপর ভরসা করে আমরা চালিয়ে নিয়ে যাই, সফলতার মালিক মহান আল্লাহ। বুধবার মাগরিবের পর থেকে মারকায প্রাঙ্গণ মুখরিত হয়ে ওঠে মেহমানদের পদচারণায়। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে মেহমানরা আসতেছেন, আর স্বেচ্ছাসেবক ভাইয়েরা তাদের সাদরে গ্রহণ করছেন। এ বছর মারকাযের তাখাসসুছাতের যেসব ছাত্রভাই স্বেচ্ছায় সূলুকে নাম দেন, তাদেরকেও মসজিদের চতুর্থ তলায় থাকার ব্যবস্থা করা হয়। যা হোক, বৃহস্পতিবার ফজরের নামায শেষে মা'মুলাতের পর ইশরাক আদায় করা হয়। এরপর সকাল ৭টা থেকে ৭.৪৫ মিনিট পর্যন্ত একটি ব্যতিক্রমধর্মী মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়, যা সচরাচর কোথাও দেখা যায় না। তা হলো, পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাহফিল। এ ধরনের একটি নতুন অনুষ্ঠানের আয়োজন কেন? হযরতওয়ালা (দামাত বারাকাতুহুম) বলেন, আমাদের প্রতিটি দ্বীনি মাহফিলে কুরআনের তেলাওয়াত হয়। কিন্তু তা নিতান্তই স্বল্প। তেলাওয়াত একটু দীর্ঘায়িত হলে আমাদের মধ্যে বিরক্তিভাব চলে আসে। আফসোস! মানুষের বয়ান খুব আগ্রহ সহকারে শ্রবণ করি, আর মহান আল্লাহর কালাম শুনতে অনীহা প্রকাশ করি। অথচ মানুষের বয়ানে যে হেদায়াত হবে এর কোনো গ্যারান্টি নেই, কিন্তু পবিত্র কুরআন শ্রবণে তিনটি উপকার তো

অবশ্যই হয়। ১. দিলের ময়লা পরিষ্কার হয়। ২. আল্লাহর মুহাব্বত এবং ভালোবাসা সৃষ্টি হয়। ৩. প্রতিটি হরফের বিনিময়ে কমপক্ষে ১০টি করে নেকী পাওয়া যায়। এসব উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আয়োজন করা হয় এ ব্যতিক্রমধর্মী অনুষ্ঠানের। এরপর নাশতার বিরতি এবং তারানা অনুষ্ঠিত হয়। তারানার পরপর শুরু হয় ইজতিমার মূল আনুষ্ঠানিকতা। সর্বপ্রথম আকাবেরদের মালফুজাত (বাণী) সংবলিত কিতাব থেকে পড়ে শোনানো হয়। "মাজালিসে আবরার" থেকে পড়ে শোনান হযরত ওয়ালার (দামাত বারাকাতুহুম)-এর খলীফা, জামি'আতুল আবরার-এর মুহাদ্দিস হযরত মাওলানা আযীযুল হক সাহেব। মালফুজাতের সারাংশ ছিল, কুরআন তেলাওয়াতের গুরুত্ব। হযরত শাহ আবরারুল হক হারদুঈ (রহ.) (১৯২০-২০০৫ ইং) বলতেন, বেশি বেশি কুরআন তেলাওয়াত করো। আর বিশুদ্ধভাবে পড়তে সচেষ্ট হও। পড়া অশুদ্ধ হলে কোনো অভিজ্ঞ কারীর কাছে যাও। যদি তোমার ঘড়ি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে অভিজ্ঞ মেকানিকের কাছে যাও, তাহলে তোমার কুরআন তেলাওয়াত অশুদ্ধ হলে অভিজ্ঞ কারীর কাছে কেন যেতে চাও না? যিকিরের প্রতি গুরুত্বারোপ করে ইমাম গাজ্জালী (রহ.) (৫০৫ হি.) বলতেন, যিকিরের মাধ্যমেও যদি তোমার অন্তরে পরিবর্তন সাধিত না হয় তাহলে বুঝে নাও তোমার অন্তর রোগাক্রান্ত। যেমন যে ব্যক্তি সর্দি-কাশিতে আক্রান্ত, সে ঘ্রাণ-দুর্গন্ধ কিছুই অনুভব করতে পারে না। এরপর সকাল ৯টায় মসজিদে হযরত ফক্বীহুল মিল্লাত (দামাত বারাকাতুহুম) উপস্থিত হন। সকালের বয়ানে হযরতওয়ালা (দামাত বারাকাতুহুম) দু'আর প্রতি খুব বেশি গুরুত্বারোপ করেন। হযরত বলেন, আমাকে অনেকে জিজ্ঞাসা করেন, হযরত! লাগাতার অবরোধ, টানা হরতাল, চারদিকে রেললাইন উপড়ে ফেলা হচ্ছে, সারা দেশের সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন, আমরা ইজতিমায় আসব কিভাবে? আমি বলি, আমরা আপনাদের জন্য দু'সপ্তাহ পূর্ব থেকে দু'আ আরম্ভ করে দিয়েছি। হে আল্লাহ! যারা ইখলাসের সাথে সংশোধনের নিয়তে এই ইজতিমায় অংশ গ্রহণ করতে চায়, তাদেরকে তুমি সহজভাবে পৌঁছিয়ে দাও। আমাদের দেশকে শান্তির দেশ বানিয়ে দাও। অশান্তি-মারামারি, হানাহানি, ঝগড়া, রক্তপাত, খুনাখুনি বন্ধ করে দাও। বিশৃঙ্খলাকারীদের শ্যেনদৃষ্টি থেকে আমাদের রক্ষা করো। আমাদের ইসলাহী ইজতিমা, টঙ্গীর বিশ্ব ইজতিমা কবুল করো। আর আপনাদের দায়িত্ব হচ্ছে, হযরত ইউসুফ (আ.)-এর মতো প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। হযরত বলেন, আমাদের অন্তরে দু'আর গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য বসাতে হবে। আমরা কোনো মুসীবতে পড়লে বলি, দু'আও করো। এটা ঠিক নয়। বরং বলতে হবে, দু'আই করো, অন্য আসবাব পরে। আমাদের অবস্থা কী? ঘরে চাল নেই, মাদরাসায় ডাল নেই, তখন আমরা ধনাঢ্য ব্যক্তিদের কাছে ধরনা দিই কেন? আমরা তাদের কাছে না গিয়ে মহান আল্লাহর দরবারে চাইতে পারি না? আমাদের একীন পয়দা করতে হবে। আপনাদেরকে এক দু'আওয়ালার বিরিয়ানি খাওয়ার মজার ঘটনা শোনাই। ঈশার নামাযের পর মুয়াজ্জিন যখন খানা খেতে বসল, তখন দেখল মসজিদের কোণে এক ব্যক্তি শুয়ে আছে। মুয়াজ্জিন তাকেও খানা খাওয়ার জন্য ডাকলে সে বলল, তরকারি কী আছে? মুয়াজ্জিন বলল, ডাল শাক-সবজি। লোকটি বলল, আমি ওগুলো খাই না। শুধু বিরিয়ানি খাই। এরপর লোকটি ঘুমিয়ে পড়ল। এদিকে মধ্যরাতে মুয়াজ্জিন সাহেব শুনতে পেল যে, কে যেন দরজায় টোকা দিচ্ছে। সে দরজা খুলে দিলে এক ব্যক্তি বলল, হুজুর! আপনার জন্য বিরিয়ানি নিয়ে এসেছি। মুয়াজ্জিন মনে মনে ভাবল, এত আমার জন্য নয়, বরং মসজিদে ঘুমন্ত ব্যক্তিটির জন্য। মুয়াজ্জিন সাহেব তাকে জাগ্রত করে দিল। লোকটি হাত-মুখ ধুয়ে খেতে বসল। যেহেতু বিরিয়ানি বেশি ছিল, তাই খাওয়ার জন্য মুয়াজ্জিনকেও ডাকল। মুয়াজ্জিন বলল, আমি খাব না বরং আপনি এখন কিছু খান, অবশিষ্টগুলো সকালে খাবেন। লোকটি বলল, আমি বাসি বিরিয়ানি খাই না। সুবহানাল্লাহ! আল্লাহর জাতের ওপর এই লোকটির কত বিশ্বাস দেখুন! ইসলাহী ইজতিমার উদ্দেশ্যই হচ্ছে, দু'আওয়ালা হওয়া। আল্লাহর জাতের ওপর পূর্ণ আস্থা সৃষ্টি হওয়া। আমাদের চিরশত্রু ইবলিশও বসে নেই। সে আমাদেরকে বিভিন্ন ভাবে ধোঁকা দিতে চেষ্টা করে। এই বলে শয়তান আমাদের ধোঁকা দেয় যে, তুই তো বড় পাপী, তোর দু'আ আল্লাহর দরবারে গ্রহণযোগ্য হবে না! সুতরাং অযথা আল্লাহর দরবারে দু'আ করে কোনো লাভ নেই। এই হচ্ছে শয়তানের এক বড় ধোঁকা। আরে ভাই! গুনাহগারের গুনাহ তো আল্লাহ মাফ করবেন। আল্লাহওয়ালাদের তো কোনো গুনাহ নেই। হাদীস শরীফগুলো পড়ে দেখুন, التائب من الذنب كمن لا ذنب له গুনাহ থেকে তাওবাকারী ব্যক্তি নিষ্পাপ ব্যক্তির সাদৃশ্য হয়ে যায়। আরেকটি হাদীসে আছে-

ما اصر من استغفر ولو كان فى اليوم سبعين مرة

অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি দিনে সত্তরবার গুনাহ করার পরও যদি ক্ষমা প্রার্থনা

করে তাহলে তার দু'আ অবশ্যই কবুল করা হবে। গুনাহ মাফ হওয়ার সহজ পদ্ধতি হচ্ছে তাওবা করা, কালিমায়ে তাইয়িবাহ, দরুদ শরীফ, ইস্তিগফার পড়ে খালেস দিলে তাওবাহ করতে পারলে আপনার জন্য রয়েছে মহান প্রভুর পক্ষ থেকে এই ঘোষণা, يبدل الله سيئاتهم حسنات তাদের গুনাহগুলো মহান আল্লাহ সওয়াব দ্বারা পরিবর্তন করে দেবেন। এরপর হযরতওয়ালা একটি ঈমানদীপ্ত ঘটনা শোনান। একবার এক অঞ্চলে বৃষ্টি একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। সেখানে ছিল আল্লাহর এক ওলী। লোকেরা তার কাছে গিয়ে বলল, হযরত! আমরা অনাবৃষ্টিতে কষ্ট পাচ্ছি। আপনি যদি ইস্তিসকার নামায (আল্লাহর দরবারে বৃষ্টি চাওয়ার জন্য যে বিশেষ নামায পড়া হয়) পড়ে আমাদের জন্য একটু দু'আ করেন, তাহলে মহান আল্লাহ হয়তো আমাদের অঞ্চলে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন। ওই বুজুর্গ টানা তিন দিন ইস্তিসকার নামায আদায় করেন কিন্তু বৃষ্টির কোনো নাম-গন্ধও দেখা যাচ্ছে না। ওই বুজুর্গ অস্থির হয়ে পড়লে মহান আল্লাহ তাকে ইলহাম করলেন যে, তোমাদের এলাকার অমুক পাপী ব্যক্তি যদি আমার কাছে স্বীয় কৃতকর্মের জন্য তাওবা করে তাহলে আমি তোমাদের ওপর বৃষ্টি বর্ষণ করব। তুমি তো কোনো পাপ করোনি। তখন ওই বুজুর্গ লোকদেরকে বললেন, অমুক ব্যক্তিকে তাওবা করতে বলো, তাহলে তোমাদের ওপর বৃষ্টি বর্ষিত হবে। ওই লোকটি মুনাজাত করে হাত নামানোর পূর্বেই পুরো এলাকায় মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে গেল। দেখুন! কী আশ্চর্য ঘটনা। স্মরণ রাখবেন, আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া নিষেধ। আমাদের আক্বীদা হচ্ছে, اليأس من الله كفر " আল্লাহর রহমত থেকে নৈরাশ হওয়া কুফরী।"

দু'আ কত দিন করতে থাকব? যত দিন উদ্দেশ্য অর্জিত হবে না, তথা মৃত্যু পর্যন্ত। আপনার দু'আ যদি কবুল না হয় তাহলে আপনি আল্লাহর দরবার ছেড়ে অন্য কোন দরবারে যাবেন? আল্লাহর দরবার ছাড়া কি অন্য কোনো দরবার আছে? নেই। দু'আ কবুল হোক বা না হোক, ওই দরবার ছেড়ে যাবেন কোথায়? এক কিতাবে জনৈক বুজুর্গের একটি আশ্চর্য ঘটনা পড়লাম। এক বুজুর্গ প্রতি বছর হজ্বে গিয়ে যখন বলতেন, لبيك اللهم لبيك হে আল্লাহ! তোমার বান্দা হাজির। তখন উত্তর আসত لالبيك তোমার আসা কবুল হল না। এ দিকে প্রতি বছর তার এ ঘটনাগুলো অন্য এক বুজুর্গ দেখতেন। একবার তিনি তাকে বললেন, আপনার হজ্ব যখন কবুল হচ্ছে না এর পরও আপনি প্রতি বছর হজ্ব করতে আসেন কেন? তখন প্রথম বুজুর্গ স্বর্ণাক্ষরে লেখার মতো ঐতিহাসিক উত্তর দিয়েছিলেন, ভাই! কবুল হোক বা না হোক, দরবার তো একটাই, ওটা ছেড়ে যাব কোথায়? তার এ অবস্থা দেখে আল্লাহর রহমতে জোশ এসে গেল। আসমান থেকে উত্তর এলো, لبيك يـــا عبـدى হে আমার বান্দা! আমি তোমার ডাকে হাজির। আল্লাহর রহমতে জোশ নিয়ে আসার চেষ্টা করুন। বান্দার কাছে ধরনা দেয়ার মন-মানসিকতা পরিত্যাগ করুন। অনেক সময় বান্দা চাইতে থাকে কিন্তু তার দু'আ কবুল হয় না। কারণ তার চাওয়া আল্লাহর কাছে এতই পছন্দনীয় যে, সে যত চায় আল্লাহর তত ভালো লাগে। এজন্য কবুল না হলেও নিরাশ হতে নেই। আল্লাহর অদৃশ্য ভাণ্ডার থেকে নেয়ার রাস্তা অবলম্বন করুন। কেন চাঁদা করতে হবে? শাহ আবরারুল হক (রহ.) বলতেন

اللہ کے پاس حاجت رکھو بندے کے پاس حالت رکھو۔

আল্লাহর কাছে প্রয়োজন খুলে বলো। বান্দার কাছে তোমার অবস্থা তুলে ধরো। তার কাছে চাইবে কেন? আমরা যখন প্রথম মারকাযের রিপোর্ট তৈরি করি, তখন সেখানে লেখা ছিল, *دردمندانہ اپیل* (আকুল আবেদন) হযরত হারদুঈ (রহ.) তা দেখে বললেন,

دردمندانہ اپیل کیا ہے؟ لکھو، اگر آپ کے پاس اس سے اہم اور ضروری کام نہو تو یہاں شریک ہو سکتے ہیں۔

আকুল আবেদন আবার কী? বরং লিখুন, এর চেয়ে কোনো গুরুত্বপূর্ণ খাত যদি না পেয়ে থাকেন, তাহলে এখানে ভালো কাজে অংশগ্রহণ করতে পারেন। "মা'আরিফুস সুনান" প্রণেতা মাওলানা ইউসুফ বিন নুরী (রহ.) (মৃ. ১৩৯৭ হি.) বলতেন, চার ধরনের আসবাব (জীবিকা নির্বাহের মাধ্যম) রয়েছে। ১. চাকরি ২. কৃষি ৩. ব্যবসা-বাণিজ্য–এই তিনটি উপকরণ আলেম উলামা, সাধারণ পাবলিক সবার জন্য। ৪. চতুর্থ উপকরণ হচ্ছে, দু'আ। কিছু লোক দু'আর মাধ্যমে চলে। সাহাবায়ে কেরাম (রা.)ও এই চারটি উপকরণই অবলম্বন করেছেন। কেউ ছিলেন চাকরিজীবী, কেউ ক্ষেত-খামার নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন, কেউবা ছিলেন ব্যবসায়ী, আবার অনেকেই ছিলেন, যারা দু'আর মাধ্যমে নিজেদের সব প্রয়োজন পূর্ণ করতেন। (যেমন আসহাবে সুফফা) তবে স্মরণ রাখবেন, উল্লিখিত প্রথম তিনটি আসবাব হচ্ছে, অনিশ্চিত আর চতুর্থ উপকরণ হচ্ছে সুনিশ্চিত এবং সন্দেহাতীত।

অনেকে প্রশ্ন করেন, হুজুর! দু'আওয়ালা কিভাবে হব? আমি বলি, আপনি খানেকাহী জীবনে অভ্যস্ত হোন। অল্পে তুষ্ট হোন এবং অনবরত দু'আ করতে থাকুন। তাহলে ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তা'আলা আপনাকে দু'আওয়ালা বানিয়ে দেবেন।

সকাল ১১টার দিকে হযরতওয়ালা

(দামাত বারাকাতুহুম) বয়ান সমাপ্ত করেন। এরপর বয়ান করেন, মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ-এর শিক্ষাসচিব হযরত মাওলানা মুফতী জামাল উদ্দীন সুবহানী সাহেব। তিনি আত্মার যিকির সম্পর্কে খুব গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা উপস্থাপন করেন। জোহরের নামাযের পর "মানবজীবনে সুন্নাতের বাস্তব অনুশীলন" এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর হৃদয়গ্রাহী আলোচনা করেন, হযরত মাওলানা মুফতী সুহাইল সাহেব। এরপর ক্বেরাতের মাশক্ব (অনুশীলন) করান মারকাযের প্রধান ক্বারী মাওলানা আব্দুল মা'বুদ সাহেব। আসরের নামাযের পর মেহমানরা নাশতা এবং হযরতওয়ালা (দামাত বারাকাতুহুম)-এর সাথে মোলাকাত করেন। মাগরিবের পর "আকাবেরদের অনুসরণ"-এর ওপর গুরুত্বপূর্ণ বয়ান করেন ভোলার বিশিষ্ট আলেম, হযরতওয়ালার খলীফা মুফতী ফয়জুল্লাহ সাহেব ভোলভী। এরপর আবার বয়ান শুরু করেন হযরতওয়ালা ফক্বীহুল মিল্লাত (দামাত বারাকাতুহুম)। হযরতওয়ালা প্রথমে বলেন, এই নূরানী জলসার নাম আমি রেখেছিলাম সালেকীনদের মোযাকারা। কিন্তু অন্যরা রাখল ইসলাহী ইজতিমা। আমাদের এত কষ্ট সহ্য করে দূর-দূরান্ত থেকে সমবেত হওয়ার একমাত্র কারণ স্বীয় আত্মার সংশোধন। আমাদের উদ্দেশ্য কোনো গতানুগতিক ওয়াজ-মাহফিল করা নয়। এটি কোনো রাজনৈতিক সমাবেশও নয়। এখানে আলোচনা হবে শুধুমাত্র যমীনের নিচে এবং আসমানের ওপরের বিষয় নিয়ে। এখানে যমীনের ওপরের কিংবা আসমানের নিচের কোনো আলোচনাই হবে না। কারণ কী জানেন? কারণ হলো, আমরা যাদের উত্তরসূরি, অর্থাৎ আমাদের আকাবেরদেরকে আমরা এ পদ্ধতির ওপরই পেয়েছি। ব্রিটিশ খেদাও আন্দোলনের সূতিকাগার দারুল উলুম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা হুজ্জাতুল ইসলাম মাওলানা কাসেম নানুতভী (রহ.) (১২৪৮-১২৯৭ হি.) দেওবন্দ মাদরাসার জন্য যে পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করেছিলেন, যা সারা বিশ্বে দরসে নেযামী নামে পরিচিত, সেখানে আপনি জাগতিক বিষয় সম্পর্কে কোনো আলোচনাই পাবেন না। হয়তো যমীনের নিচের অথবা আসমানের ওপরের আলোচনাই সন্নিবেশিত হয়েছে সেখানে। হযরত নানুতভী (রহ.)-এর উসূলে হাস্তগানাহ (অষ্ট মূলনীতি) দেখুন, সেখানে স্পষ্ট লেখা আছে, কওমী মাদরাসা সরকারের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া আমি অত্যন্ত ক্ষতিকর মনে করি। আমরা যদি এখন সরকারি স্বীকৃতি নিই, আপনিই বলুন, নানুতভী (রহ.)-এর সাথে আমাদের আন্তরিক সম্পর্ক বিনষ্ট হবে কি না? পাকিস্তানের মুফতী আজম মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহ.) (১৩১৪-১৩৯৬ হি.) বলতেন, یہ نصاب الہامی نصاب ہے এই দরসে নিযামী কোনো মনগড়া পাঠ্যসূচি নয়, বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে তথা ইলহামী পাঠ্যসূচি। আমাদের আকাবেরদের ইখলাস কোন পর্যায়ের ছিল, তা শুনুন। এত বড় ইজতিমা হচ্ছে, দেশের প্রায় প্রতিটি অঞ্চল থেকে প্রতিনিধি ওলামায়ে কেরামের জমায়েত হচ্ছে, কিন্তু কোথাও কি এই ইজতিমার জন্য পাবলিসিটি করতে শুনেছেন? কোথাও ব্যানার কিংবা ফেস্টুন চোখে পড়েছে? কোনো দাওয়াতনামা বা আমন্ত্রণপত্র ছাপানো হয়েছে? উত্তর না। কারণ আমাদের বসুন্ধরা মারকায যে মহান বুজুর্গের রুহানী তাওয়াজ্জুহে চলে, সে মহান আল্লাহর ওলী শাহ আবরারুল হক (রহ.)-এর কড়া নিষেধ হচ্ছে, মাদরাসার জন্য কোনো পাবলিসিটি করা যাবে না। ব্যানার টানানো যাবে না। যখন প্রথম প্রথম এখানে মারকায প্রতিষ্ঠা করা হয়, তখন এখানে ছিল জঙ্গল আর জঙ্গল, ছিল না কোনো জনবসতি। শিক্ষকরা আমাকে পরামর্শ দিল, হুজুর! মারকাযের জন্য একটা বিজ্ঞাপন দেওয়া যায় না? আমি বললাম, না। তারা বলল, হুজুর একটা ব্যানার তো টানানো যায়? আমি বললাম, তাও সম্ভব না। তারা বলল, হুজুর! তাহলে আল্লাহর বান্দারা জানবে কিভাবে যে, এখানে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে? আমি বললাম, *من جد وجد* যে চেষ্টা করবে সে অবশ্যই খুঁজে পাবে। তারা বলল, হুজুর! যদি কোনো ছাত্র না আসে? আমি বললাম, তাহলে আমরা শিক্ষকরা পরস্পরে মোযাকারা (আলোচনা) করব আর ইবাদত বন্দেগী করব। এখন আপনারাই বলুন, কোনো প্রচারণা ছাড়া মহান আল্লাহ মারকাযের সুনাম সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিয়েছেন কি না? আমাদের এই নূরানী ইজতিমায় অংশগ্রহণ করার জন্য আলেমরা কত কষ্ট স্বীকার করছেন তা শুনলে চোখের পানি আটকে রাখা যায় না। নোয়াখালীর কিছু আলেম আমাকে বলল, তারা কিছুক্ষণ হেঁটে, কিছুক্ষণ রিকশায় চড়ে, কিছুক্ষণ বাসে চড়ে এখানে উপস্থিত হয়েছেন। চট্টগ্রাম থেকে অনেক বড় বড় আলেমের একটা জামাত এখানে উপস্থিত হয়েছে রেলে চড়ে। তারা রেলে প্রায় ১১ ঘণ্টা দাঁড়িয়ে ছিলেন। কক্সবাজারের পোকখালী মাদরাসা ও আশপাশের মাদরাসা থেকে এক জামাত এসেছে একটি গাড়ি ভাড়া করে। উত্তরবঙ্গের অনেক বড় বড় আলেম এখানে উপস্থিত হয়েছেন রেলের ছাদে চড়ে। কতই না কষ্ট স্বীকার করেছেন তারা। আল্লাহ সকলকে উত্তম প্রতিদানে ভূষিত করুন।

আলহামদুলিল্লাহ! আমাদের মারকায থেকে প্রকাশিত দাওয়াত ও আত্মশুদ্ধিমূলক সাময়িকী মাসিক 'আল-আবরার' মূলত প্রকাশিত হয় আলেমদের জন্যই। কিন্তু আপনারা তো

এর মূল্যায়ন করছেন না। যারা মূল্যায়ন করছে, তাদের মন্তব্য শুনুন, সরকারের উচ্চ পদস্ত এক কর্মকর্তা আমাদেরকে ফোন করে বললেন, আপনাদের মাসিক আল-আবরার আমাকে ধ্বংসের অতল গহ্বর থেকে রক্ষা করেছে। নয়তো এত দিনে আমি কোয়ান্টামের ঈমানবিধ্বংসী শিরকী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়ে পড়তাম। সারা বাংলাদেশে আল-আবরার নিয়ে যাচ্ছে। আপনারাও অংশগ্রহণ করে সদকায়ে জারিয়ার সওয়াব অর্জন করুন। এরপর হযরত ওয়ালা (দামাত বারাকাতুহুম) সবাইকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, আপনারা সবাই আলেম। সবাই মাদরাসার বিভিন্ন সেবায় নিয়োজিত আছেন। মাদরাসায় সেবা করবেন খেদমতের নিয়তে, গতানুগতিক চাকরি করবেন না। খেদমত আর চাকরির মধ্যে মৌলিক পার্থক্য হলো, খেদমতে মন-মানসিকতা, চিন্তা-চেতনা থাকবে মাদরাসার উন্নতি অগ্রগতি, ছাত্রদের পড়ালেখার তরক্কীর ওপর। আর চাকরিতে মন-মানসিকতা মনোযোগ থাকে সময়ের প্রতি, দস্তখতের প্রতি। পুরোদিন আমি ব্যক্তিগত কাজে মাদরাসায় অনুপস্থিত ছিলাম, কিন্তু এর পরও স্বাক্ষর করতে আমার বিবেক অন্তরায় হয়ে দাঁড়াচ্ছে না। আকাবেরদের জীবনী পড়ুন। শায়খুল হাদীস যাকারিয়া (রহ.) (মৃ. ১৪০২ হি.) আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'আপবীতি'তে উল্লেখ করেন যে, সাহারানপুরের মুহতামিম বড় আল্লাহওয়ালা ও মুত্তাকী লোক ছিলেন। অনেক সময় তার ব্যক্তিগত কাজের কারণে তার মাদরাসায় আসতে বিলম্ব হতো। যেটুকু তিনি মাদরাসায় দেরি করে আসতেন তা নোট করে রাখতেন। মাস শেষে তা দপ্তরে জমা দিয়ে সে পরিমাণ বেতন কম নিতেন। সুবহানাল্লাহ! আমাদের কী অবস্থা! আবু দাউদ শরীফের প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাগ্রন্থ বজহুল মাজহুদ প্রণেতা মাওলানা খলীল আহমদ সাহারানপুরী (রহ.) (১২৬৯-১৩৪৬) এর একটি ঘটনা শুনুন। তিনি একবার হাদীস পড়াচ্ছিলেন। এমতাবস্থায় তার এক আত্মীয় (বড় সরকারি অফিসার ছিলেন) দেখা করতে আসলেন। যতক্ষণ ঘণ্টা শেষ হয়নি, ততক্ষণ সাহারানপুরী (রহ.) তার দিকে ভ্রুক্ষেপও করেননি। সবক শেষ হওয়ার পর তিনি তার আত্মীয়কে ডাকলেন। কিন্তু তিনি যে কার্পেটের ওপর বসে সবক পড়াচ্ছিলেন, তা তুলে ফেললেন। এ অবস্থা দেখে মেহমানের খুব রাগ হচ্ছিল। হযরত সাহারানপুরী (রহ.) তা বুঝতে পেরে বললেন, এই কার্পেট আমাকে সবক পড়ানোর জন্য দেওয়া হয়েছে। আমরা যেহেতু এখন ব্যক্তিগত বিষয়ে আলোচনা করব, তাই এর ওপর বসা আমাদের জন্য বৈধ হবে না। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে আকাবেরদের পদাংক অনুসরণ করার তাওফীক দান করুন।

ইজতিমার দ্বিতীয় দিন : জুমাবার

ফজরের নামায এবং মা'মুলাতের পর প্রথমে জুমার দিনের আমলসমূহ আলোচনা করা হয়। এরপর গতকালের ন্যায় ক্বেরাত মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এরপর সকাল ৯টার দিকে হযরত ফক্বীহুল মিল্লাত (দামাত বারাকাতুহুম) মসজিদে তাশরীফ নিয়ে আসেন। সকালের বয়ানে হযরতওয়ালা সূলুক এবং তরীকতের ওপর খুব গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন। সোহবতে শায়খ বা শায়খের সান্নিধ্যের গুরুত্ব, খেলাফত নিয়ে সাধারণ মানুষের মাঝে প্রচলিত বিভিন্ন ভ্রান্ত বিশ্বাসের অপনোদন করেন। হযরতওয়ালা দা.বা. সর্বপ্রথম একজন মুরীদের কোন কোন গুণ থাকা দরকার, তা নিয়ে সবিস্তারে আলোকপাত করে বলেন, একজন মুরীদকে অবশ্যই তিনটি গুণের অধিকারী হতে হবে। ১. পীরের আক্বীদত তথা ভক্তি-শ্রদ্ধা। ২. মুহাব্বত তথা আপন পীরের সাথে অকৃত্রিম ভালোবাসা। ৩. পীরের ইত্বাআত তথা আনুগত্য। (নিজের বোধগম্য হোক বা না হোক) সাথে সাথে আপন পীরের মেজাজ শিনাস তথা তার স্বভাব-প্রকৃতি সম্পর্কে সম্যক অবগত হতে হবে। 'অমুক মুরীদ পীরের খেলাফত লাভে ধন্য হলো' এর অর্থ 'ওই মুরীদ কামেল হয়ে গেল' তা নয়। বরং এর অর্থ হলো, তার বাহ্যিক অবস্থার ওপর সার্টিফিকেট দেয়া হলো। এটা তার বুজুর্গী বা পরিপূর্ণতার দলিল নয়। যেমন আমাদের দেশে দাওরায়ে হাদীসের ছেলেদেরকে সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। ক্বারী আমীর হোসাইন (রহ.) একজন বড় মাপের বুজুর্গ ও হযরত শায়খুল হাদীস যাকারিয়া (রহ.)-এর অন্যতম খলীফা ছিলেন। তিনি সর্বদা হারদুঈ (রহ.)-এর সামনে ছাত্রের মতো বসে থাকতেন। হযরতওয়ালা (দামাত বারাকাতুহুম) বলেন, আমার এক উস্তাদ ছিলেন হাটহাজারীর বড় মুফতী সাহেব (রহ.)-এর খলীফা। তিনি সর্বদা বাবুনগরের মাওলানা হারুন বাবুনগরী (রহ.)-এর দরবারে বসে থাকতেন। যখনই আমি হারুন (রহ.)-এর দরবারে যেতাম তখনই আমার উস্তাদকে সেখানে বসা দেখতাম। আপনি দেখুন, পীরের প্রতি কী ধরনের ভক্তি-শ্রদ্ধা।

স্বীয় পীরের বর্তমানে আমি কিভাবে আরেকটা দরবার খুলতে পারি? স্বীয় পীরের জীবদ্দশায়ও, তার মৃত্যুর পরও তার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখতে সচেষ্ট হতে হবে। দারুল উলুম দেওবন্দের এত সুখ্যাতি কেন? এটা হচ্ছে আমাদের আকাবিরদের রুহানী তাওয়াজ্জুহ, নানুতভী (রহ.) (১২৪৮-১২৯৭) এর ফয়জের বরকত। এ অর্জনকে কেউ যদি

নিজ যোগ্যতা ও মেধার ফল মনে করে তা হবে নিতান্তই বোকামি ও স্রেফ অজ্ঞতা। একটি ঘটনা শুনুন, দেওবন্দের এক শিক্ষক বার্মায় (মিয়ানমার) মাদরাসার জন্য চাঁদা তুলতে গেলে অনেক টাকা চাঁদা পান। পরে কর্তৃপক্ষের সাথে কিছু সমস্যা হলে তিনি দেওবন্দ থেকে ইসতিফা দিয়ে চলে আসেন। পরে তিনি অন্য মাদরাসায় শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পান। ওই মাদরাসা থেকে তিনি পুনরায় বার্মায় চাঁদা তুলতে গেলে আসা-যাওয়ার খরচ পর্যন্ত তিনি তুলতে পারেননি। এর কারণ কী? কারণ, তিনি প্রথমবার গিয়েছিলেন দেওবন্দের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে, পরবর্তীতে ওই সম্পৃক্ততা বিনষ্ট হয়ে যাওয়ায় তিনিও আর চাঁদা পাননি। আমাদের এই যে বসুন্ধরা মারকায, জামি'আতুল আবরার, সেন্টার ফর ইসলামিক ইকোনমিক্স এগুলো কিভাবে চলে? এগুলো চলে একমাত্র শাহ আবরারুল হক (রহ.)-এর তাওয়াজ্জুহের বরকতে। আপনারা এত দূর-দূরান্ত থেকে এত কষ্ট করে কেন আসলেন? এজন্য আসলেন, যেহেতু আমরা হযরত হারদুঈ (রহ.)-এর সাথে সম্পৃক্ত। আপনাদের সাথে এই সম্পর্ক কিভাবে বাকি থাকবে? সহজ উত্তর হচ্ছে, তার সাথে আমাদের সম্পর্ক অবশিষ্ট থাকলে আপনাদের সাথেও আমাদের সম্পর্ক অবশিষ্ট থাকবে। আমি আপনাদেরকে হারদুঈর গল্প শোনাচ্ছি। হযরত হারদুঈ (রহ.)-এর মৃত্যুর পূর্বে ওখানকার যে অবস্থা, হযরতের মৃত্যুর পরও একই অবস্থা বিরাজ করছে। কারণ, হারদুঈর যারা তত্ত্বাবধায়ক তারা হযরতের পদাংক পূর্ণভাবে অনুসরণ করে চলেছেন। তাই ওখানকার অবস্থা অপরিবর্তনীয়। আপনারা যদি চান, বসুন্ধরাও এই গতিতে চলতে থাকুক, তাহলে আপনাদেরকেই হিম্মত এবং সাহসের সাথে এগিয়ে আসতে হবে। আর যারা এই মারকাযের কর্তৃপক্ষ তাদেরকেও বিষয়টির প্রতি সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। আপনারা যদি হারদুঈ (রহ.)-এর সাথে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে ফেলেন তাহলে এখন যে ফয়জ-বরকত দেখতে পাচ্ছেন তা থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবেন।

আমি আবারো আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে, পীরের খেলাফত পাওয়ার অর্থ পরিপূর্ণ হওয়া নয়, বরং তা বাহ্যিক একটি সনদ মাত্র। খেলাফত কখন বিনষ্ট হবে? পীরের সাথে যদি আপনার সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তাহলে মনে করুন, আপনার খেলাফত বিনষ্ট হয়ে গেল।

তাহলে আজকের বয়ানের সারাংশ হচ্ছে, একজন মুরীদকে অবশ্যই তিনটি গুণের অধিকারী হতে হবে। ১. পীরের ভক্তি ও শ্রদ্ধা। ২. মুহাববত ও ভালোবাসা। ৩. তার আনুগত্য। সাথে সাথে স্বীয় পীরের স্বভাব প্রকৃতি সম্পর্কেও হতে হবে পূর্ণ সচেতন।

এরপর বয়ান শেষ হলে জুমার নামাযের বিরতি দেওয়া হয়। জুমার নামাযের পর বয়ান করেন, হযরত আশরাফ আলী থানভী (রহ.) (১২৮০-১৩৬২)-এর বিশিষ্ট খলীফা, তাওবার রাজনীতির প্রবর্তক মাওলানা মুহাম্মদুল্লাহ হাফেজ্জী হুজুর (রহ.) (১৩১৪-১৪০৭)-এর দীর্ঘদিন সান্নিধ্যপ্রাপ্ত ছাত্র প্রফেসর হামীদুর রহমান সাহেব। তিনি বলেন, আপনারা সবাই আলেম, আপনাদেরকে কী বলব? হ্যাঁ, আকাবেরদের কিছু আমানত আমার কাছে গচ্ছিত আছে তা আপনাদের কাছে হস্তান্তর করে যাব। আমি যখন প্রথম হযরত হাফেজ্জী হুজুর (রহ.)-এর দরবারে যাই তখন তিনি আমাকে সর্বপ্রথম চোখের গুনাহ থেকে বাঁচতে নসীহত করেন।

বসুন্ধরার এই মারকায যার বরকতে চলে, সে মহান বুজুর্গের কাহিনী আপনাদের শোনাচ্ছি। হযরত শাহ আবরারুল হক হারদুঈ (রহ.) ১৯৮১ সালে বাংলাদেশ সফরে আসেন। সাথে ছিলেন হযরতের শীর্ষ খলীফা আরেফ বিল্লাহ মাওলানা হাকীম আখতার (রহ.) (১৯২৮-২০১৩ ইং) আমরা সবাই মেহমানসহ হাজী বশীর সাহেবের বাসায় অবস্থান করি। যখন নামাযের সময় হলো, তখন আমরা বললাম, হযরত! নামায বাড়িতে পড়ে নিলে ভালো হয়। কারণ, মসজিদ অনেক দূরে। হযরত জিজ্ঞাসা করেন, কত দূর হবে? আমরা বললাম, হেঁটে গেলে ২০ মিনিট আর গাড়িতে গেলে ৫ মিনিট সময় লাগবে। তখন হযরত মুহিউস সুন্নাহ (রহ.) বললেন, গাড়ি নিয়ে বাজারে যেতে পারেন, জান্নাতে গাড়ি নিয়ে যেতে চান না কেন? হাফেজ্জী (রহ.) হযরত থেকে বয়সে বড় ছিলেন। হযরত হারদুঈ (রহ.) দেখলেন যে, খেলাফত অফিসে জামাত হচ্ছে। প্রথম দিন দেখে কিছুই বললেন না। দ্বিতীয় দিনও যখন অফিসে জামাত হতে দেখলেন, রাগান্বিত হয়ে বললেন, আরে ভাই! হাদীস শরীফে জামাতের যেসব ফজীলত বর্ণিত হয়েছে তা মসজিদের জামাত সম্পর্কে, অফিসের জামাত সম্পর্কে নয়। প্রফেসর সাহেব বলেন, ঈশার নামাযের পর আমরা লালবাগের উদ্দেশে রওনা হলাম। হযরত দেখতে পেলেন যে, রাস্তায় লালবাতি জ্বালানো অবস্থায়ও ড্রাইভার পুরোদস্তর গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছে, থামানোর নাম-গন্ধও নেই। হযরত ড্রাইভারকে বললেন, রাস্তায় লালবাতি জ্বালানোর পরও আপনি গাড়ি না থামিয়ে চালিয়ে যাচ্ছেন, কারণ কী? ড্রাইভার বলল, হযরত! পুলিশ তো নেই। তাই থামারও প্রয়োজন নেই। তখন হযরত বললেন, শুধুমাত্র জ্ঞান যথেষ্ট নয়, তাকওয়া বা খোদাভীতিরও প্রয়োজন রয়েছে। পরদিন হাফেজ্জী হুজুর (রহ.)সহ গেলেন শহীদবাড়িয়ার

(ব্রাহ্মণবাড়িয়া) দারুল উলুম মাদরাসার বার্ষিক সভায়। আমরা পৌঁছে প্রথমে নাশতা করি। তখন মাইকে কুরআন তেলাওয়াত হচ্ছিল। হযরত মুহিউস সুন্নাহ (রহ.) জিজ্ঞাসা করলেন, এখন কুরআন তেলাওয়াত হচ্ছে কেন? তারা বলল, আপনারা মাহফিলে উপস্থিত হয়েছেন। তাই লোকদেরকে সমবেত করার উদ্দেশ্যে কুরআন তেলাওয়াত হচ্ছে। হযরত রাগান্বিত হয়ে বললেন, থামাও। অপবিত্র বান্দার আসার এলান হচ্ছে পবিত্র কালামের তেলাওয়াতের মাধ্যমে। এটা কেমন কথা? তারা যখন স্টেজে পৌঁছেন তখন চৌদ্দ/পনের বছরের একটা ছেলে দাঁড়িয়ে কুরআন তেলাওয়াত করছিল। তখন হযরত বললেন, আমরা বসে থাকব। আর কুরআন তেলাওয়াতকারী দাঁড়িয়ে থাকবে। এটা কেমন কথা?

আমাদের আকাবেরদের কিছু আমানত আমার কাছে সংরক্ষিত ছিল, তা আপনাদের কাছে সযত্নে পৌঁছে দিলাম। আল্লাহ আমাদেরকে আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন! এরপর গুরুত্বপূর্ণ বয়ান করেন হযরতওয়ালা ফক্বীহুল মিল্লাত (দামাত বারাকাতুহুম)-এর খলীফা মাওলানা মাহমুদুল আলম (দামাত বারাকাতুহুম)। এরপর হযরতওয়ালা (দামাত বারাকাতুহুম)-এর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত ভোলা জেলার খানেকাহে এমদাদিয়া আশরাফিয়া আবরারিয়ার কারগুজারি শুনান খানেকাহের জিম্মাদার মাওলানা বশীরুদ্দীন সাহেব। আসরের নামাযের পর সর্বপ্রথম ৮০ বার দরুদ শরীফের আমল হয়। এরপর হযরতওয়ালা (দামাত বারাকাতুহুম) সালেকীনদেরকে সর্বশেষ দিকনির্দেশনামূলক নসীহত প্রদান করেন। সর্বশেষে আখেরী মুনাজাতের মাধ্যমে দুই দিনব্যাপী নূরানী ইজতিমার পরিসমাপ্তি ঘটে।

প্রিয় পাঠক! দু'আ, দরূদ, যিকির-আযকার এবং ওয়াজ-নসীহতের মাধ্যমে শেষ হয় দুই দিনব্যাপী নূরানী ইসলাহী ইজতিমা। এই ইসলাহী ইজতিমার মাধ্যমে কতজন যে তার মহান রবের সাথে সম্পর্কোন্নয়নে সচেষ্ট হয়েছেন তার কোনো ইয়ত্তা নেই। আমরা মহান প্রভুর কাছে দু'আ করি, এই বিশাল আলেমদের ইসলাহী ইজতিমা যে মহান মুরব্বির তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং সুচারুরূপে পরিচালিত হচ্ছে, সে মহান ব্যক্তির ছায়া এবং বরকত যেন আল্লাহ তা'আলা আমাদের ওপর দীর্ঘায়িত দেন। সর্বোপরি এই ইজতিমাকে আল্লাহ তা'আলা কবুল করে নেন এবং ইসলাহী ইজতিমার এ পবিত্র ধারা যেন কিয়ামত পর্যন্ত চালু থাকে এ দু'আ করে লেখাটার এখানেই ইতি টানছি।

আত্মশুদ্ধির পথে মাসিক আল-আবরারের স্বার্থক দিকনির্দেশনা অব্যাহত থাকুক

টাইলস এবং সেনিটারী সামগ্রীর বিশ্বস্ত ও ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান

Importers & General Marchant of Sanitary Goods & Bath Room Fittings

J.K SANITARY

Shop # 10, Green Super Market (Ground Floor) Green Road Dhaka 1205, Bangladesh
Tel : 0088-02-9135987 Fax : 0088-02-8121538 Mobile : 0088-01675 209494, 01819 270797
E-mail: taosif07@gmail.com

Rainbow Tiles

2, Link Road, Nurzahan Tower, Shop No: 09
80/20 Mymansing Road, Dhaka, Bangladesh
Tel : 0088-02-9612039,
Mobile : 01674622744, 01611527232
E-mail: taosif07@gmail.com

Monalisa Tiles

25/2 Bir Uttam C.R. Dutta Road
Hatirpool, Dhaka, Bangladesh.
E-mail: taosif07@gmail.com
Tel: 0088-029662424,
Mobile: 01675303592, 01711527232

বি.দ্র. মসজিদ মাদরাসার ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ থাকবে

নারী নির্যাতন রোধে ইসলাম

মুফতি মুহাম্মাদ শোয়াইব

নারী নির্যাতনের ভয়াবহ চিত্র এখনও আমরা পত্রিকায় দেখি। কোমলমতি শিশু থেকে অশীতিপর বৃদ্ধ পর্যন্ত কেউই রেহাই পাচ্ছে না নির্যাতনের হাত থেকে। নারীর প্রতি সহিংসতা ক্রমেই ভয়ানক রূপ ধারণ করছে। চার থেকে পাঁচ বছরের যে শিশু, সেও ধর্ষণের শিকার হচ্ছে পাষণ্ড লম্পট দ্বারা। অবস্থা এমন হয়েছে যে, নারী মানেই নির্যাতন, নারী মানেই বৈষম্য। নারী নির্যাতন সমাজের মরণব্যাধির রূপ ধারণ করেছে। এক জরিপে দেখা গেছে, বিবাহিত নারীদের প্রতি চারজনের একজন স্বামীর নির্যাতনের শিকার। বিশেষত নারীকে পণ্য করে বাজারে তোলার যে সংস্কৃতি চালু হয়েছে তাও নারী নির্যাতন, এসিড নিক্ষেপ, নারী ধর্ষণ, নারীর শ্লীতাহানির অন্যতম কারণ। পণ্যের বিজ্ঞাপনে নারীকে আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে ব্যবহার, ইন্টারনেট এবং গণমাধ্যমে নারীকে যৌন আবেদনময়ী করে উপস্থাপন নারীর যৌন হয়রানিকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে।

নারীর প্রতি সমাজের এই দৃষ্টিভঙ্গি ইসলাম সমর্থন করে না। বরং এই মনোভাবের কঠোর নিন্দা করেছে ইসলাম। নিশ্চিত করেছে নারীর নিরাপদ ও সম্মানজনক জীবন। নারী শৈশবে কন্যা, যৌবনে স্ত্রী, বার্ধক্যে মা আর সাধারণভাবে বোন–এই চারটি স্তর অতিক্রম করেই তাকে সাফল্যের চূড়ায় উপনীত হতে হয়। নারীর যতটি স্তর আছে সব স্তরেই ইসলাম নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেছে। ইসলাম নারীকে মা হিসেবে, বোন হিসেবে, কন্যা হিসেবে ও স্ত্রী হিসেবে সম্মান দিয়েছে। নারী যেমন কন্যা, স্ত্রী হিসেবে অত্যন্ত আদরণীয়, আবার মা ও বোন হিসেবে সম্মানের পাত্র। সুতরাং কোনো স্তরেই নারীর প্রতি সহিংসতা করার, তাকে অবহেলা করার, তাকে নির্যাতন করার সুযোগ নেই।

পুরুষের সঙ্গে নারীর যত দিক থেকে সম্পর্ক হতে পারে ইসলাম সব সম্পর্ককে সম্মান করেছে, অনন্য মর্যাদা ও মহিমায় অধিষ্ঠিত করেছে। এ ক্ষেত্রে নারীকে শুধু সমমর্যাদা নয় বরং অগ্রমর্যাদা দান করা হয়েছে।

মা হিসেবে নারীর মর্যাদা

প্রথমত ইসলাম নারীকে মা হিসেবে মর্যাদা দিয়েছে। মা হিসেবে ইসলাম নারীকে যে পরিমাণ মর্যাদা দিয়েছে তা পৃথিবীর কোনো ধর্ম ও সভ্যতায় কল্পনাই করা যায় না। বিশেষ করে আধুনিক সভ্যতায় সে কল্পনা করা স্বপ্নবিলাস ছাড়া কিছুই নয়। আল কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদাচারের নির্দেশ দিয়েছি। কারণ তার মা তাকে কষ্টের সঙ্গে গর্ভে ধারণ করেছে এবং কষ্টের সঙ্গে প্রসব করেছে।' (সূরা আহকাফ : ১৫) এখানে বাবা-মা দুজনের সঙ্গে ভালো আচরণ করার কথা বলা হলেও অবদান উল্লেখ করতে গিয়ে মায়ের কষ্টের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ বাবার ও বিরাট অবদান রয়েছে সন্তানের জীবনে। এটা এদিকেই ইঙ্গিত করে যে, বাবার তুলনায় মায়ের মর্যাদা বেশি। কারণ মায়ের কষ্টের কাছে বাবার কষ্ট ও ত্যাগ খুবই সামান্য। এক হাদিসে এসেছে, জনৈক সাহাবি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে জিজ্ঞেস করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার সদাচার পাওয়ার সবচেয়ে বেশি হকদার কে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার মা। সাহাবি বললেন, এরপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। সাহাবি বললেন, এরপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। সাহাবি বললেন, এরপর কে? তিনি বললেন, তোমার বাবা।" (বুখারী শরীফ, হাদিস নং ৫৯৭১) অপর এক হাদিসে আছে, এক সাহাবি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'-এর কাছে এসে আরজ করলেন, আমি জিহাদে যেতে চাই। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার বাবা-মা কেউ কি জীবিত আছেন? সাহাবি হ্যাঁসূচক জবাব দিলে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, যাও তাদের সেবা করে তুমি জিহাদের সওয়াব কামাই করে নাও।" অপর বর্ণনায় আছে, যাও তার কাছে গিয়ে বসে থাকো। কেননা জান্নাত তার পায়েরই কাছে। " (বুখারী শরীফ হাদিস নং, ২৬৪২,মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা ১৩/৮০, মুসনাদে আহমাদ ৩/৪২৯) এক হাদিসে আছে, জান্নাত মায়ের পায়ের নিচে।' (মুস্তাদরাকে হাকিম, হাদিস নং ৭৩৩০)

স্ত্রী হিসেবে নারীর মর্যাদা

স্ত্রী হিসেবে ইসলাম নারীজাতিকে অধিকার ও মর্যাদা দিয়েছে। স্বামীকে নির্দেশ দিয়েছে স্ত্রীর সঙ্গে ভালো আচরণ করার। আল কোরআনে বলা হয়েছে, 'আর তোমরা স্ত্রীদের সঙ্গে বসবাস কর

সদাচারের সাথে। আর যদি তোমরা কোনো কারণে তাদেরকে অপছন্দ করো তাহলে হয়তো তোমরা এমন একটি বস্তুকে অপছন্দ করলে, যাতে আল্লাহ তা'আলা প্রভূত কল্যাণ রেখেছেন। (সূরা নিসা : ১৯) এক হাদিসে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, 'কোনো মুমিন পুরুষ যেনো কোনো মুমিন নারীকে অপছন্দ না করে।' (সহিহ মুসলিম : হাদিস নং ১৪৬৯, সুনানে ইবনে মাজা : হাদিস নং ১৯৭৯) এই হাদিসে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

দাম্পত্যজীবনের কলহ নিরসন ও নারীর প্রতি সহিংসতা দূরীকরণের একটি মূলনীতি বলে দিয়েছেন। স্ত্রীর সকল আচরণ স্বামীর কাছে ভালো লাগবে, এটা অসম্ভব। আবার স্বামীর সকল আচরণ স্ত্রীর কাছে ভালো না লাগাই স্বাভাবিক। কারণ আল্লাহ তা'আলা কাউকেই পূর্ণতা দান করে সৃষ্টি করেননি। প্রত্যেকের ভেতরেই কিছু না কিছু মন্দ স্বভাব থাকবেই। ভালো ও মন্দ মিলেই মানুষ। কাজেই স্ত্রীর কোনো স্বভাব স্বামীর কাছে অপছন্দ হলে সে যেন ধৈর্যধারণ করে এবং ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখে। স্ত্রীর ভালো গুণগুলোর দিকে লক্ষ করে আল্লাহর শোকর আদায় করে এবং তার প্রশংসা করে।

এ ক্ষেত্রে প্রত্যেক স্বামীর জন্য রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জীবনই উত্তম আদর্শ। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন ঘরে যেতেন স্ত্রীদের সঙ্গে ঘরের কাজে শরিক হতেন। তাদের সাথে সদাচার করতেন। স্ত্রীদের সঙ্গে খোশ-গল্প করতেন। তাদের সঙ্গে হাসিমুখে কথা বলতেন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কখনো কোনো স্ত্রীকে প্রহার করেননি। তিনি যখন তাহাজ্জুদের সময় উঠতেন তখন খুব আস্তে দরজা খুলতেন, যাতে ঘরের লোকদের ঘুমে ব্যাঘাত না হয়। তিনি ইরশাদ করেন, 'তোমরা স্ত্রীদের সঙ্গে উত্তম আচরণ করো। (তিরমিজি শরীফ : হাদিস নং ১১৬৩) অন্য হাদিসে আছে তোমাদের মধ্যে সেই উত্তম, যে তার স্বামীর কাছে উত্তম।' (জামে তিরমিজি : হাদিস নং ১১৬২)

বোন হিসেবে নারীর মর্যাদা

বোন হিসেবেও নারীর সম্মান দিয়েছে ইসলাম। হাদিস শরীফে আছে, 'কারো ঘরে যদি তিনজন বা দুজন কন্যা অথবা ভগ্নি থাকে আর সে তাদেরকে উত্তম শিক্ষা দান করে এবং তাদের উত্তম পাত্রে বিবাহ দেয় তাহলে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়। অন্য বর্ণনায় আছে, তাহলে সে আর আমি জান্নাতে এরূপ পাশাপাশি থাকব। তারপর তিনি দুটি আঙুল পাশাপাশি রেখে ইশারা করলেন।...

কন্যা হিসেবে নারীর মর্যাদা

কন্যা হিসেবে নারীর সম্মান সবচেয়ে বেশি দিয়েছে ইসলাম। ইসলামপূর্ব যুগে কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করা ছিল বাবার জন্য কলংকজনক। আল কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে, 'যখন তাদেরকে কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করার সুসংবাদ দেয়া হতো তখন লজ্জায় তাদের চেহারা কালো হয়ে যেত। আর বিষাদে আচ্ছন্ন হয়ে থাকত। তারা ভাবত, লোকলজ্জা উপেক্ষা করে তারা কি তাদেরকে রেখে দেবে, না মাটিতে পুঁতে ফেলবে। কত মন্দ ছিল তাদের এ মনোভাব।' (সূরা নাহল ৫৮) জাহিলিয়্যাতের যুগে যখন কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করাই ছিল বাবার জন্য কলংকজনক, যখন কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করলেই জীবন্ত কবর দেয়া হতো তখন ইসলাম তার অধিকার দিয়েছে এবং এই নিষ্ঠুর প্রথার চরম নিন্দা করেছে। ইরশাদ হয়েছে, 'আর যখন জ্যান্ত দাফনকৃত কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে, কোন অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছে তখন তারা কী জবাব দেবে? (সূরা আততাকভীর ৮ও৯)

নারীর ব্যাপারে ইসলামের নবী (সা.) যে আদর্শ রেখে গেছেন সেই আদর্শই নারীর সম্মান ও মুক্তির উপায়। এ ছাড়া মানবপ্রসূত যত আইন বা আদর্শ আছে সেগুলোর মাঝে নারীর শান্তি বা মুক্তি নেই। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, আমরা নারীর শান্তি খুঁজি মানবপ্রসূত সভ্যতায়। আরো আশ্চর্যের বিষয় হলো, যে ইসলামের মধ্যে নারীর শান্তি-স্বস্তিনির্ভর করে, সে ইসলামকেই আজকে চিত্রিত করা হচ্ছে নারী-উন্নয়নের প্রধান অন্তরায় হিসেবে। ইসলামকে আজ নারীর শত্রুরূপে প্রধান আসামির কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর পাঁয়তারা করছে বিভিন্ন মহল। বলা হচ্ছে, ইসলামের বিধান পালন করলে নারী কয়েক যুগ পিছিয়ে যাবে। ইসলামের হিজাব নারীর জন্য কলংকজনক। (নাউজু বিল্লাহ) এ ধরনের জঘন্য ও ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানার মতো বক্তব্য মানবতা পরিপন্থী। অপরদিকে তথাকথিত আধুনিক সভ্যতার বলি হয়ে নারী জাতি বার বার লাঞ্ছিত-অপমানিত ও নিগৃহীত হয়েছে এবং হচ্ছে তাতেই খোঁজা হচ্ছে নারীদের মুক্তির উপায়। আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করুন। পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন, নারীদের সাথে সদ্ভাবে জীবন যাপন করো।' (সূরা নিসা, আয়াত নং ১৯) হাদিস শরীফে আছে, 'নারীগণ

পুরুষদেরই সহোদরা' (মুসনাদে আহমাদ ও আবু দাউদ)

এ দেশের পবিত্র ও ঐতিহ্যবাহী নারীদের মনে রাখতে হবে দিবস পালন আর মিছিল-মিটিং ইত্যাদি নারী নির্যাতন বন্ধের উপায় নয়। বরং এসব রাজনৈতিক কূটচাল মাত্র। বরং নারীদেরকে তাদের প্রকৃত ও সঠিক অধিকার আদায়ে সতর্ক হতে হবে। প্রত্যেক পরিবারের নারীরা নিজেদের শালীনতার প্রতি লক্ষ রেখে পরিবারের পুরুষ সদস্যদেরকে বোঝাবে নারীদের সাথে পুরুষদের আচরণ এমন হওয়া উচিত। এর জন্য নারীদেরকে প্রয়োজনীয় ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে। সচেতন হতে হবে। দেশের মা-বোনগণ যখন নিজেদের অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে সতর্ক হবেন এবং পুরুষদের সাথে তাদের আর তাদের সাথে পুরুষদের আচার আচরণ কিরূপ হতে হয় তার দীক্ষা গ্রহণ করবেন এবং তা আমলে আনতে সক্ষম হবেন ইনশাআল্লাহ দেশ বা সমাজে নারী নির্যাতন শূন্যের কোটায় নেমে আসবে। এ ক্ষেত্রে নারীদের কার্যকর, বাস্তবসম্মত ও ত্যাগী ভূমিকা রাখতে হবে।

চশমার জগতে যুগ যুগ ধরে বিখ্যাত ও বিশ্বস্ত

মেহবুব অপটিক্যাল কোং

এখানে অত্যাধুনিক মেশিনের সাহায্যে চক্ষু পরীক্ষা করা হয়।
পাইকারি ও খুচরা দেশি-বিদেশি চশমা সুলভ মূল্যে বিক্রি করা হয়।

১২ পাটুয়াটুলি রোড, ঢাকা ১১০০
ফোন : ০২- ৭১১৫৩৮০ , ০২- ৭১১৯৯১১

১৩ গ্রীন সুপার মার্কেট, গ্রীন রোড,
ঢাকা-১২১৫। ফোন : ০২-৯১১৩৮৫১

মাসিক আল-আবরারের গ্রাহক ও এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলি

এজেন্ট হওয়ার নিয়ম

*	কমপক্ষে ১০ কপির এজেন্সি দেয়া হয়।
*	২০ থেকে ৫০ কপি পর্যন্ত ১টি, ৫০ থেকে ১০০ পর্যন্ত ২টি, আনুপাতিক হারে সৌজন্য কপি দেয়া হয়।
*	পত্রিকা ভিপিএলে পাঠানো হয়।
*	জেলাভিত্তিক এজেন্টদের প্রতি কুরিয়ারে পত্রিকা পাঠানো হয়। লেনদেন অনলাইনের মাধ্যমে করা যাবে।
*	২৫% কমিশন দেয়া হয়।
*	এজেন্টদের থেকে অগ্রীম বা জামানত নেয়া হয় না।
*	এজেন্টগণ যেকোনো সময় পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করে অর্ডার দিতে পারেন।

গ্রাহক হওয়ার নিয়ম

বার্ষিক চাঁদার হার

	দেশ	সাধ.ডাক	রেজি.ডাক
#	বাংলাদেশ	৩০০	৩৫০
#	সার্কভুক্ত দেশসমূহ	৮০০	১০০০
#	মধ্যপ্রাচ্য	১১৮০	১৩০০
#	মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া	১৩০০	১৫০০
#	ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া	১৬০০	১৮০০
#	আমেরিকা	১৮০০	২১০০

১ বছরের নিচে গ্রাহক করা হয় না। গ্রাহক চাঁদা মনিঅর্ডার, সরাসরি অফিসে বা অনলাইন ব্যাংকের মাধ্যমে পাঠানো যায়।

ব্যাংক অ্যাকাউন্ট :

শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড
আল-আবরার-৪০১৯১৩১০০০০০১২৯

আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড
আল-আবরার-০৮৬১২২০০০০৩১৪

জিজ্ঞাসা ও শরয়ী সমাধান

কেন্দ্রীয় দারুল ইফতা বাংলাদেশ

পরিচালনায় : মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ, বসুন্ধরা, ঢাকা।

প্রসঙ্গ : যাকাত

ইঞ্জি. হাজী মুহাম্মদ আব্দুল বাতেন
আগ্রাবাদ, এক্সচেঞ্জ রোড,
চট্টগ্রাম।

জিজ্ঞাসা

আমাদের এলাকার একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি তার যাকাতের অংশ এতিমদের জন্য দান করেন। এতিমদের অভিভাবকগণ তা গ্রহণ করে এতিমদের বসবাসের ঘর না থাকাতে তা দিয়ে এবং অন্যান্যদের থেকে পাওয়া অর্থ দিয়ে এতিমদের জন্য ঘর নির্মাণ করে দিতে চাইছেন। এমতাবস্থায় একজন বললেন, দাতা ব্যক্তির যাকাত আদায় নাও হতে পারে। অতএব দাতা ব্যক্তির যাকাত আদায় হলো কি না?

সমাধান

যাকাত খাওয়ার উপযোগী এতিমদের অভিভাবকগণ তাদের পক্ষ থেকে যাকাতের টাকা গ্রহণ করলে যাকাত আদায় হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় ওই টাকা দিয়ে এতিমদের জন্য অভিভাবকগণ ঘর নির্মাণ করে দিলে এতে যাকাত দাতার যাকাত আদায় হওয়ার ব্যাপারে কোনো ধরনের সংশয় নেই। (তুহফাতুল ফুক্বাহা ১/৩০৭, ফাতাওয়ায়ে রহিমিয়া ৭/৩৬৮)

প্রসঙ্গ : নামায ও দু'আ

মুহা: হাবিবুল্লাহ বাহার
১৫৭ শান্তিনগর, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা

আমরা প্রায়ই দেখি কিছু কিছু মসজিদের ইমাম ও মুসল্লী বিভিন্ন প্রকার আমল করেন, যেমন-

(১) ফজরের ফরজ নামাযের সালাম ফিরানোর পর ইমাম সাহেব মুক্তাদিদের দিকে ঘুরে বসেন, সম্মিলিতভাবে উচ্চস্বরে 'আউযুবিল্লাহিস সামিইল আলীমি মিনাশশায়তানির রাজিম' তিনবার পড়েন, এরপর সম্মিলিতভাবে উচ্চস্বরে সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত একবার পড়েন, তারপর ইমাম (মুক্তাদিদের দিকে ফিরে থাকা অবস্থায় অর্থাৎ কিবলাকে পেছনে রেখে) সম্মিলিতভাবে উচ্চস্বরে দুই হাত উঠিয়ে দু'আ পড়েন। ইমাম সাহেব আসর নামাজের পর ও মুক্তাদিদের দিকে ঘুরে বসে (মুক্তাদিদের দিকে ফিরে থাকা অবস্থায় অর্থাৎ কিবলাকে পেছনে রেখে) এবং সম্মিলিতভাবে উচ্চস্বরে দুই হাত উঠিয়ে দু'আ পড়ে।

(২) ইমাম সাহেব প্রতি বৃহস্পতিবার ইশার নামায শেষে মুক্তাদিদের দিকে ঘুরে বসেন ও উচ্চস্বরে সূরা ইয়াসিন পড়েন এবং মুক্তাদিরা তা শোনেন, তারপর ইমাম (মুক্তাদিদের দিকে ফিরে থাকা অবস্থায় অর্থাৎ কিবলাকে পেছনে রেখে) সম্মিলিতভাবে উচ্চস্বরে দুই হাত উঠিয়ে দু'আ করে।

(৩) কিছু কিছু মুসল্লী প্রতিবার নামায শেষে মসজিদ থেকে বের হওয়ার পূর্বে ইমাম সাহেবকে সালাম দিয়ে মুসাফাহা করেন ও দুই হাত বুকে মালিশ করেন সাথে সাথে অন্য মুসল্লীদের সাথেও এরূপ মুসাফাহা করেন। কোনো কোনো সময় দু'আর পূর্বে সম্মিলিতভাবে উচ্চস্বরে দরূদ পড়েন। ঈদের নামায শেষে সবার সাথে ৩ বার কোলাকুলি করেন।

সমাধান

(১) মুসল্লীদের দিকে ফিরে বসা এবং সম্মিলিতভাবে দু'আ করা শরীয়তসম্মত আমল। আর সূরা হাশরের আয়াতগুলো মুসল্লীদের শেখানো বা স্মরণ করিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্য উচ্চস্বরে তিলাওয়াত করা বৈধ। তবে এটাকে ধারাবাহিক নিয়ম বানিয়ে নেওয়া অনুচিত। (সহীহুল বুখারী ১/১১৭)

(২) সূরা ইয়াসিন তিলাওয়াত যেমন সওয়াবের কাজ তা শ্রবণ ও সওয়াবে কাজ, তবে নির্ধারিত কোনো দিন বা পন্থাকে বাধ্যতামূলক মনে করে পালনের প্রথা বর্জনীয়। (মিশকাতুল মাসাবীহ ১/১৮৭)

(৩) সালাম মুসাফাহা বা মু'আনাকাহ মূলত সাক্ষাতের সুন্নত, বিধায় নামাযের পর এ সকল আমলের প্রথা বর্জনীয়। দু'আর পূর্বে সম্মিলিতভাবে উচ্চস্বরে দরূদ পড়াকে বাধ্যতামূলক মনে না করা হলে এবং এর দ্বারা কারো নামাযের ব্যাঘাত না হলে তা বৈধ হবে অন্যথায় নয়। (মিশকাতুল মাসাবীহ ২/৪০১)

প্রসঙ্গ : দান

মুহা: মাহবুবুর রহমান
কম্পিউটার অপারেটর
ঢাকা লিয়াজোঁ অফিস, বনানী, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা

১. আমি চাকরি পাওয়ার পূর্বে নিয়ত করেছিলাম, চাকরি হলে প্রাপ্ত বেতনের একটি নির্দিষ্ট অংশ (১০%) মসজিদে দান করব। এখন উক্ত টাকা শুধুমাত্র মসজিদেই দিতে হবে নাকি ইসলাম অনুমোদিত যেকোনো খাতে দেয়া যাবে? এবং ইছালে সওয়াব জিন্দা-মুর্দা সকলের জন্য করা যাবে কি না?

২. সুদের টাকা দানের ব্যাপারে ইসলামী নিয়ম কী এবং কাকে দেয়া যাবে? সুদের টাকা দিয়ে মাদরাসা-মসজিদ ও এতিমখানার টয়লেট নির্মাণ বা রাস্তা-ঘাট তৈরির কাজে খরচ করা যাবে কি না?

৩. অফিস হতে শার্ট, প্যান্ট, স্যুট ও জুতা ক্রয়ের জন্য প্রদত্ত টাকা অন্য কাজে খরচ করে, অফিসের নির্দিষ্ট ছকে শার্ট, প্যান্ট, স্যুট ও জুতার বিবরণ লিখে জমা দিলে মিথ্যার গুনাহ হবে কি না?

সমাধান

(১) আপনি যে পরিমাণ টাকা মসজিদে দেওয়ার নিয়ত করেছেন তা মসজিদে দেওয়াই উত্তম। অন্য খাতেও ব্যয় করা নিষেধ নয়। ইসালে সওয়াব জিন্দা-মুর্দা সকলের জন্য করা যাবে। (রদ্দুল মুহতার ২/৪৪১)

(২) সুদের টাকা না নেওয়ার চেষ্টা করবেন। যদি নিতেই হয় গরিব-মিসকীনদের যারা যাকাত খেতে পারে তাদের দেওয়া জরুরি। মাদরাসা, মসজিদ ও এতিমখানার টয়লেট বা রাস্তা-ঘাট ইত্যাদি ওই টাকা দিয়ে বানানো বা অন্য কোনো কাজে খরচ করা জায়িয হবে না। (রদ্দুল মুহতার ৫/৯৯)

(৩) মিথ্যা লিখে টাকা গ্রহণ করা গুনাহ হবে। (সহীহুল বুখারী ১/১০, আদ্দুররুল মুখতার ২/২৫৪)

প্রসঙ্গ : মেশিনে মুরগি ড্রেসিং

মুফতী মুহা: তাজুল ইসলাম
বাহুবল, হবিগঞ্জ।

জিজ্ঞাসা

বর্তমান সময়ে অনেক স্থানে পোলট্রি মুরগি জবাই করার পর মেশিনের মাধ্যমে পালক পরিষ্কার করা হয়। এ ক্ষেত্রে ভেতরের ময়লা পরিষ্কার না করেই মেশিনে দেয়া হয়। যার ফলে মুফতিয়ানে কেরাম ভেতরের নাড়িভুঁড়ি গলে গোশতের সাথে মিশে যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনার কারণে উক্ত পদ্ধতিটি নাজায়েয বলে আসছেন। কিন্তু আমি অনেক সময় পর্যবেক্ষণ করে দেখিছি যে, মেশিনের গরম পানিতে মুরগিটি যে পরিমাণ উত্তপ্ত হয় তাতে শুধুমাত্র বাহিরের চামড়াও গোশত কিছু গরম হয়, ভেতরের নাড়িভুঁড়িতে কোনো প্রকার প্রভাব পড়ে না এ ছাড়া বিষয়টি বর্তমানে আম হয়ে যাচ্ছে। তাই যেহেতু হুরমত এর কারণ পাওয়া যায় না এবং বিষয়টি ব্যাপক হয়ে যাওয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে উক্ত পদ্ধতিটি হালাল বলা যায় কি না?

সমাধান

আপনার বর্ণিত পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী যদি বাস্তবে এরূপ হয়ে থাকে, তাহলে এ রকম মুরগির গোশত নাপাক হবে না বরং তা খাওয়া জায়েয হবে। কিন্তু যদি ফুটন্ত গরম পানিতে জবাইকৃত মুরগি বেশিক্ষণ রেখে দেয়ায় ভেতরের নাড়িভুঁড়ির নাপাকি গোশতের ভেতরে মিশে যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা থাকে। তাহলে মুরগি নাপাক হয়ে যাওয়ায় তা খাওয়া জায়েয হবে না। (আদ্দুররুল মুখতার ১/৫৬, ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়া ১৭/৩৩৬)

প্রসঙ্গ : ইমামতি

মুহা: আব্দুল খালেক
সরকারি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ফার্মাসিস্ট
পাঁচবিবি, জয়পুরহাট।

জিজ্ঞাসা

(১) মসজিদের ইমাম সাহেব পায়ে ও কোমরে ব্যাথার কারণে চেয়ারে বসে ইশারার মাধ্যমে সিজদা করেন কেরাত পাঠ ও রুকু দাঁড়িয়ে করেন, এমতাবস্থায় তার ইমামতিতে মুসল্লীগণের নামায শুদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে শরীয়তের ফায়সালা কী?

(২) ওই ইমাম ফরজ নামায শেষে কোনো মুনাজাত করেন না অথচ মিলাদ বা দু'আর মাহফিলে মুনাজাত করেন, প্রশ্ন হলো, ফরজ নামাযের পর মুনাজাত করতে হবে কি না?

(৩) চেয়ারে বসে নামায পড়লে নামায হবে কি না? কোমরে ও পায়ে ব্যথার জন্য চেয়ারে বসে নামায পড়লে নামায শুদ্ধ হবে কি না?

সমাধান

(১) ইমাম সাহেব যদি ইশারা করে সিজদা আদায় করেন, তাহলে তার পেছনে ওই সমস্ত নামাযি ব্যক্তির নামায শুদ্ধ হবে না, যারা রুকু-সিজদা করে নামায পড়তে সক্ষম। (আহসানুল ফাতাওয়া ৩/২৪৬)

(২) দু'আ সব সময় করা যায়। তবে এমন কিছু বিশেষ ক্ষেত্র ও সময় আছে যে ক্ষেত্রে দু'আ করলে দু'আ কবুল হওয়ার কথা হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে। তন্মধ্য থেকে একটি জায়গা

হলো, ফরয নামাযের পর দু'আ করা। সুতরাং উক্ত সময়ে দু'আ করাকে জরুরি মনে না করে, দু'আ কবুল হওয়ার আশায় ইমাম মুক্তাদী সম্মিলিতভাবে হাত তুলে দু'আ করাতে কোনো আপত্তি নেই। (কিফায়াতুল মুফতী ৩/৩৩০)

(৩) দাঁড়াতে ও সিজদা করতে সক্ষম ব্যক্তির জন্য নামাযে দাঁড়ানো ফরয। এমনকি পুরো সময় দাঁড়িয়ে থাকতে অপারগ হলে যেটুকু সময় দাঁড়াতে পারবে তা কোনো কিছুর ওপর ঠেস দিয়ে হলেও ওই সময়টুকু দাঁড়ানো ফরয। সুতরাং যে ব্যক্তি দাঁড়াতে অক্ষম অথবা এমন দুর্বল, যা শরীয়তের দৃষ্টিতে উযর বলে বিবেচিত; যেমন দাঁড়ালে অসহনীয় ব্যথা অনুভূত হয়, অথবা রোগ বৃদ্ধির আশংকা বা সুস্থতা ফিরে আসতে বিলম্ব হওয়ার আশংকাবোধ হয়। এ সকল অবস্থাতে বসে নামায আদায় করা জায়েয। সুতরাং দাঁড়াতে অক্ষম ব্যক্তি যদি মাটিতে তথা নিচে বসে সিজদা করতে সক্ষম হয়, তবে তাকে মাটিতে বসে সিজদা সহকারে নামায আদায় করতে হবে। চেয়ার বা নিচে বসে ইশারা করে নামায পড়া জায়েয হবে না। আর যদি রুকু-সিজদাদানে অক্ষম ব্যক্তি মাটিতে বসে ইশারা করে নামায আদায়ে সক্ষম হয়, এমতাবস্থায় মাটিতে না বসে, চেয়ারে বসে নামায পড়া মাকরুহ। হ্যাঁ, যদি যেকোনো ভাবেই চেয়ার ছাড়া বসা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। তখন চেয়ারে বসে নামায আদায় করা যেতে পারে। সামান্য ব্যাথার কারণে চেয়ারে বসে নামায পড়ার যে প্রচলন বর্তমান সমাজে ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে, তা দ্বারা নামায আদায় হবে না বরং ইহা পরিহার করা একান্ত জরুরি। (খুলাসাতুল ফাতাওয়া ১/১৯৪, ফাতাওয়ায়ে রহিমিয়া ৯/৯৮)

প্রসঙ্গ : নামায

মাওলানা মুহা: হাসান
হবিগঞ্জ।

জিজ্ঞাসা

(১) কোনো ব্যক্তি দুই রাকাতবিশিষ্ট নামাযের প্রথম রাকাতে যদি তাকবীর বলে সিজদা থেকে উঠে ভুলে বসে যায় তাহলে স্মরণ হওয়া মাত্র পুনরায় তাকবীর বলে দাঁড়াবে নাকি পূর্বের তাকবীরই যথেষ্ট এবং এ ক্ষেত্রে করণীয় কী?

(২) কোনো ব্যক্তি ইমামের সাথে নামাযের প্রথম রাকাতেই অংশগ্রহণ করেছে এবং নামায শেষে ইমাম সাহেবের সাথে একদিকে সালাম ফিরানোর পর ভুলবশত নিজেকে মাসবুক ভেবে অপরদিকে সালাম না ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে যায়। এ সময় নিজের ধারণা ভুল জানতে পেরে দাঁড়িয়ে থেকেই অপরদিকে সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করে। তার এ নামায সহীহ হবে কি না?

সমাধান

(১) তিন তাসবীহ পরিমাণ সময় অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে দাঁড়িয়ে গেলে পুনরায় তাকবীর বলতে হবে না এবং এ ক্ষেত্রে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে না। অন্যথায় নতুন করে তাকবীর বলবে এবং এ ক্ষেত্রে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে। (ই'লাউস সুনান ৩/৩)

(২) দুই দিকে সালাম ফিরানো শেষ বৈঠকের সুন্নাত। প্রশ্নোক্ত সুরতে যেহেতু দ্বিতীয় সালামটি দাঁড়ানো অবস্থায় ফিরানো হয়েছে তাই এ সুন্নাতটি আদায় হয়নি। তবে এ ক্ষেত্রে নামাযে কোনো সমস্যা হয়নি। নিয়ম হলো বসে সালাম ফিরানো। (ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়া ১৬/৪১৮, ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া ১/৮৫)

প্রসঙ্গ : যাকাত

মাওলানা আবু বকর
জামিয়া কুরআনিয়া (নাছির মাঝি)
সদর ভোলা।

জিজ্ঞাসা

মুসাফির ব্যক্তির সাথে যদি কোনো সম্পদ না থাকে তাহলে সে যাকাত গ্রহণ করতে পারে। যদিও তার বাড়িতে প্রচুর সম্পদ থাকার কারণে সে ধনী ও সম্পদশালীই হোক না কেন। প্রশ্ন হলো, বর্তমানে মোবাইলে ও বিকাশ ইত্যাদির মাধ্যমে মিনিটেই বাড়ি থেকে টাকা আনা সহজ। এমতাবস্থায় কোনো সম্পদশালী মুসাফিরের সফর অবস্থায় টাকা শেষ হয়ে গেলে সে যাকাত গ্রহণ করতে পারবে কি না?

সমাধান

যদি উক্ত সম্পদশালী মুসাফির যেকোনো উপায়ে সহজে বাড়ি থেকে টাকা আনতে সক্ষম হয়, তাহলে সে যাকাত গ্রহণ করতে পারেন না। তবে যদি এমন এলাকায় হয় যেখানে বাড়ি থেকে কোনো উপায়ে টাকা আনা সম্ভব নয়, তাহলে প্রয়োজন পরিমাণ যাকাত নিতে পারবে। (রদ্দুল মুহতার ২/৩৪৩-৩৪৪)

প্রসঙ্গ : চাকরি

মুহা: শামসুজ্জামান
ঢাকা।

জিজ্ঞাসা :

বাজারে যে গরু ও খাসির গোশত বিক্রি করে তা দু'আ কালাম পড়ে সঠিকভাবে জবাই করা হয় কি না, তা কেউ জানে

না। প্রয়োজনে না কিনেও উপায় নাই।

সমাধান

গরু-খাসি অথবা যেকোনো প্রাণী আল্লাহর নামে জবাই হওয়া শর্ত। এর চেয়ে বেশি দু'আ কালাম পড়া এতে শর্ত না। বিধায় প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় জবাইকারী যেহেতু মুসলমান তাই তার প্রতি এমন ধারণা রাখা বাঞ্ছনীয় যে, তিনি আল্লাহর নাম নিয়েই জবাই করেছেন। এ ব্যপারে সন্দেহ পোষণ করার প্রয়োজন নাই। (ফাতাওয়া শামী ৬/৪৭৬, ফাতাওয়া বাযাযিয়াহ ২/৩৮৯)

প্রসঙ্গ : ওয়াকফ

মুহা: আবদুল মোতালেব
ব্লক-এফ, রোড-১, বাড়ি-২৯১
বসুন্ধরা আ/এ, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা-১

(ক) ওয়াকফ (লভ্যাংশ) টাকা দিয়ে কী গরিব আত্মীয়স্বজন এবং দুস্থ মানুষের মধ্যে বিতরণের জন্য কুরবানীর গরু কি না যায়? (খ) উক্ত টাকা হতে রমজান মাসে রোযাদার গরিব আত্মীয়স্বজন এবং গরিবদের জন্য ইফতারী বা খানার ব্যবস্থা করা যায়? (গ) এমন কোন খাত আছে কি, যাতে উপরোক্ত টাকা ব্যয় করা যায় না?

(২) বসতবাড়িতে আলমারির ভেতর বা স্যুটকেসে বা কোনো গোপন স্থানে পত্রিকার ফটো, ক্যামেরার ফটো রাখা যাবে কি?

(৩) নামাযে ইমামের পেছনে মুক্তাদির সূরা ফাতেহা বা কেরাত পড়া কি ফরজ/ওয়াজিব/ মুস্তাহাব বা নিষেধ?

সমাধান

প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে টাকা ওয়াকফ করা আপনার জন্য সহীহ হয়েছে, সুতরাং তার লভ্যাংশ থেকে প্রশ্নে বর্ণিত খাতসমূহে ব্যয় করতে পারেন। (আদ্দুররুল মুখতার ১/৩৮০)

(ক-খ) হ্যাঁ, প্রয়োজন মনে করলে উক্ত টাকার লভ্যাংশ দ্বারা কুরবানীর গরু ইফতারী, খানার ব্যবস্থা করে তা গরিবদের মাঝে বিতরণ করতে পারেন। (খুলাসাতুল ফাতাওয়া ৪/৪১২)

(গ) ওয়াকফ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভ করা তাই আপনার উক্ত ওয়াকফকৃত টাকার লভ্যাংশ শরীয়তবিরোধী কোনো কাজে ব্যয় করার অনুমতি নেই। (রদ্দুল মুহতার ৩/২৪২)

(২) উপায়হীন কোনো কারণ ছাড়া কোনো প্রাণীর ছবি তোলা বা দেখা জায়েয নেই। আর যে ঘরে প্রাণীর ছবি থাকে সেখানে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ না করার বিষয়টি হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। পত্রিকার বা ক্যামেরার ফটো দৃষ্টির অগোচরে কোনো গোপন স্থানে রাখা জায়েয হলেও অনুত্তম। তাই যথাসম্ভব তা থেকে বিরত থাকা চাই। (সহীহুল বুখারী ২/৮৮০)

(৩) কুরআনের আয়াত ও গ্রহণযোগ্য হাদীসের আলোকে এটাই প্রমাণিত যে, মুক্তাদী ইমামের পেছনে সর্বাবস্থায় সূরা ফাতিহা এবং অন্য কোনো সূরা পড়বে না বরং চুপ থাকবে। এ বিষয়টি প্রায় বড় বড় আশিজন সাহাবায়ে কেরাম থেকে বর্ণিত আছে। তাই বিজ্ঞ ফুক্বাহায়ে কেরাম ইমামের পেছনে সূরা ফাতিহা বা অন্য কোনো সূরা না পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। (সূরা আরাফ-২০৪)

প্রসঙ্গ : কিস্তিতে ক্রয়-বিক্রয়

পাবনা সিরাজগঞ্জ বস্ত্র বণিক সমিতি
গাউছিয়া সিটি আন্ডার গ্রাউন্ড মার্কেট
রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

জিজ্ঞাসা

পাবনা সিরাজগঞ্জ বস্ত্র বণিক সমিতি কিস্তির ভিত্তিতে বিভিন্ন সদস্যদের নিকট গাউছিয়া সিটি মার্কেটের আন্ডার গ্রাউন্ডে কিছু দোকান বিক্রি করেন। সমিতির নিয়ম অনুযায়ী বুকিংয়ের টাকাসহ ধার্যকৃত সমুদয় টাকা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরিশোধ করার কথা ছিল। ইতিমধ্যে অনেক সদস্যই সকল টাকা পরিশোধ করে ব্যবসা পরিচালনাও করছেন। কিন্তু সমিতির কিছু সদস্য আন্ডার গ্রাউন্ড মার্কেটে দোকান করার পর তারা আমাদের রেখে উপরের মার্কেটে দোকানদারি করে। তাদেরকে কয়েকবার নোটিশ করেও শেষ পর্যন্ত নিচে নামাতে পারিনি। কিছু সদস্য প্রথমে ৭৫০০ টাকা বুকিং দেয়। কয়েকবার নোটিশ দেওয়ার পর চূড়ান্ত নোটিশ দেওয়ার পরও তারা আর কোনো দিন টাকা জমা দেয়নি। কিছু সদস্য প্রথমে ৭৫০০ টাকা বুকিং দেওয়ার পর কয়েকবার কিছু কিছু টাকা জমা দিয়ে ১০,১২,১৫,২০ হাজার টাকা করে জমা দেয়। পরে চূড়ান্ত নোটিশ দেওয়ার পরও আর কোনো দিন টাকা জমা দেয়নি। এমতাবস্থায় উপরোক্ত সদস্যদের জমাকৃত টাকা যদি ফেরত না দিয়ে সমিতি কর্তৃপক্ষ ভোগ করে তাতে ইসলামী শরীয়তের ফয়সালা কী?

সমাধান

ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তির সময় সমিতি পক্ষ ও ক্রেতা যদি এ বলে শর্ত করে থাকে যে ক্রেতা মূল্য আদায় করতে না পারলে

বা নিদৃষ্ট সময়ের চেয়ে দেরি করলে ক্রয়-বিক্রয় বাতিল বলে বিবেচিত হবে। তাহলে সমিতি পক্ষ ক্রয়-বিক্রয়কে ভঙ্গ করতে পারবে কিন্তু ক্রেতাদের আদায়কৃত মূল্য ফেরত দিতে হবে। আর যদি শুরুতেই এ ধরনের শর্ত না করা হয়, তাহলে সমিতি পক্ষ ক্রেতার সম্মতি ছাড়া ক্রয়-বিক্রয়কে ভঙ্গ করতে পারবে না। তবে আইনি প্রক্রিয়ায় অপরিশোধিত মূল্য উসুল করার চেষ্টা করবে তা সম্ভব না হলে আইনের মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি বাতিল করবে এবং গ্রহণকৃত অর্থ ফেরত দেবে। (মুসনাদে আহমদ ৫/৪২৫, হেদায়া ৩/১৪৭)

প্রসঙ্গ : মিলাদ ও কিয়াম

আলহাজ্ব মুহাঃ মোবারক হোসেন
সেনপাড়া, সদর রংপুর।

জিজ্ঞাসা :

শরীয়তের দৃষ্টিতে প্রচলিত মিলাদ ও কিয়ামের অবস্থান কী? অনেকে বলে বিদ'আত এবং পরিহার করা জরুরি, আবার অনেকে বলে মুস্তাহাব, আবার অনেকে বলে জরুরি এবং ইমাম সাহেব মিলাদ ক্বিয়াম না করলে তাকে ইমামতি থেকে বহিষ্কার করা হবে। এমতাবস্থায় সঠিক কোনটি এবং মিলাদ ক্বিয়াম না করার অপরাধে ইমাম সাহেবকে ইমামতি থেকে বহিষ্কার করা যাবে কি না?

সমাধানঃ

মিলাদ তথা রাসূল (সা.)-এর জন্মবৃত্তান্ত ও তাঁর সীরাত আদর্শের আলোচনা একটি মহৎ ইবাদত ও অত্যন্ত বরকতময় কাজ। এতে কোনো মুসলমানের দ্বিমত থাকতে পারে না। তবে বর্তমান যুগে প্রচলিত মিলাদ ক্বিয়াম ও তার পদ্ধতির কুরআন ও হাদীসে কোনো ভিত্তি নেই এবং রাসূল (সা.) সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, তাবে তাবেঈন ও তার পরবর্তী ইসলামের স্বর্ণযুগে তার কোনো অস্তিত্ব ছিল না। মিলাদের সূচনা হয় ৬০৪ হিজরীতে ইরাকের মুসেল শহরের অপচয়ী ও ধর্মীয় ব্যাপারে উদাসীন বাদশাহ মুজাফফরুদ্দীন কুকরী ইবনে আরবল (মৃ. ৬৩০)-এর নির্দেশে এবং কিয়ামের সূচনা হয় ৭৫৫ হিজরীতে মাজযুব তক্বী উদ্দিন সবকী মালেকী (রহ.)-এর দরবারে এক কবি হুজুর (সা.)-এর শানে কবিতা পড়ার সময় তিনি জোশের বশীভূত হয়ে দাঁড়িয়ে যান। তখন থেকেই শুরু হয় প্রচলিত ক্বিয়াম।

অতএব কুরআন হাদীসের বিজ্ঞ ওলামায়ে কেরাম, ফেকাহবিদ, মুহাদ্দিসীনদের মতে মিলাদ কিয়াম ইসলামের মাঝে নবাবিষ্কৃত ও ভিত্তিহীন হওয়ায় তা বর্জনীয়। বিধায় কোনো ইমাম সাহেব প্রচলিত মিলাদ ক্বিয়াম না করলে সে সঠিক পথে আছে। তাই তাকে মিলাদ ক্বিয়াম না করার কারণে ইমামতি থেকে বহিষ্কার করা বৈধ হবে না। (সুনানে তিরমিযী ২/১০৪, ফয়জুল বারী ২/৪০৬)

প্রসঙ্গ : টেলিফোনে বিয়ে

মুহাঃ হাবিবুর রহমান
কিশোরদিয়া, মাদারীপুর।

জিজ্ঞাসা

এক মেয়ে টেলিফোনে ছেলেকে (বর) বলল, আমি মুসাম্মৎ সামিয়া নূর, পিতা : শেখ নূর মুহাম্মদ, আপনি মুহাম্মদ আবুল হাসানের সাথে বিবাহ বসতে রাজি এবং এ ব্যাপারে আমি আমার পক্ষ থেকে বিবাহের কাজ সম্পাদন করার জন্য আপনাকে উকিল বানিয়ে দিলাম। অতএব আপনি দু'জন সাক্ষীর উপস্থিতিতে বিবাহের কাজ সম্পাদন করে ফেলুন। অতঃপর ছেলে ওই ফোনের মাধ্যমেই সাক্ষীগণের উপস্থিতিতে মেয়ের নাম-ঠিকানা উল্লেখ করত বলল, আমি তোমাকে পাঁচ লক্ষ টাকা মহর ধার্য করে বিবাহ করলাম। মেয়ে বলল, আমি কবুল করলাম। উক্ত ইজাব কবুল এবং বরকে উকিল বানানোর বিষয়টি লাউড স্পিকারের মাধ্যমে সাক্ষীগণ বিবাহের মজলিসে শুনেছেন। এমতাবস্থায় উক্ত বিবাহ শরীয়ত মুতাবেক সহীহ হয়েছে কি না?

সমাধান

শরীয়তের দৃষ্টিতে কনে যদি নিজের বিবাহ সম্পাদনের জন্য বরকে উকিল বানায়। অতঃপর বর দু'জন সাক্ষীর সামনে কনের নাম-ঠিকানা উল্লেখ করে উক্ত বিবাহে সম্মতি জানায় তখন উকিল হিসেবে তার এ সম্মতিই ইজাব, কবুলের স্থলাভিষিক্ত গণ্য হবে। তাই প্রশ্নে বর্ণিত উকিল মুহাম্মদ আবুল হাসানের উক্তি-আমি তোমাকে পাঁচ লক্ষ টাকা মহর ধার্য করে বিবাহ করলাম-ইজাব কবুল হিসেবে গণ্য হবে। এ ক্ষেত্রে কনের পক্ষ থেকে কবুল পড়া নিষ্প্রয়োজন, এর কোনো ধর্তব্য নেই। সুতরাং দু'জন সাক্ষীর সামনে উক্ত ইজাব কবুল প্রক্রিয়া সম্পাদন হওয়াতে বিবাহ সহীহ হয়েছে। (আল হিন্দিয়া ১/৩২৪, খুলাসাতুল ফাতাওয়া ২/১৫)

প্রসঙ্গ : বিবাহ

মুহাঃ শহিদুল আনোয়ার
লালবাগ, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা

জনৈক আলেম মহিলা মাদরাসায় অধ্যয়নরত তার ফুফাতো বোনকে এই শর্তে বিবাহ করে যে, দাওরা পাস করার পর তাকে স্বামীর বাড়িতে উঠিয়ে দেওয়া হবে। উভয়ের বাসস্থান কাছাকাছি হওয়াতে চাইলে সহজেই একে অপরের বাড়িতে যাতায়াত করতে পারে। ছুটিতে উভয়ে নিজ বাড়িতে অবস্থান করে কিন্তু ওই শর্তের কারণে স্ত্রীর মা-বাবা তাকে স্বামীর কাছে যেতে দেয় না। বর্তমানে স্বামীর পরিবার দাবি করছে যে, অন্তত শুক্রবার দিন যেন স্ত্রীকে স্বামীর বাড়িতে এসে সাক্ষাতের সুযোগ দেওয়া হয়। স্ত্রী পক্ষ পড়ালেখার অজুহাতে কিছুতেই তাকে আসতে দেবে না। শরীয়তের দৃষ্টিতে এমন শর্তের গুরুত্ব কতটুকু এবং স্ত্রীকে স্বামীর কাছে যেতে বাঁধা প্রদান কেমন?

সমাধান

স্বামীর সন্তুষ্টি অর্জনের মাঝে নারী জাতির পরকালীন মুক্তি নিহিত। বিবাহোত্তর স্বামীর যাবতীয় হক আদায় স্ত্রীর ঈমানী দায়িত্ব। অনুরূপ স্ত্রীর খোরপোষও বাসস্থানসহ সকল হক আদায় স্বামীর একান্ত কর্তব্য। বিবাহের সময়কৃত কোনো শর্তের কারণে এ সকল হক লঙ্ঘিত হলে শর্তটি বাতিল বলে গণ্য হবে। আলেম স্বামীকে রেখে ইলম অর্জনের জন্য মহিলা মাদরাসায় গমন দ্বীনের নামে নিছক বদদ্বীনি। এমন গর্হিত শর্তের বাহানায় স্ত্রীকে স্বামীর কাছ থেকে পৃথক করে রাখা মারাত্মক গুনাহ। অতএব, বিগত দিনের ভুলের কারণে অনুতপ্ত হয়ে তওবাকরত স্ত্রীকে তার স্বামীর কাছে অবাধে গমনের সুযোগ করে দেয়া সংশ্লিষ্ট সকলের একান্ত কর্তব্য। আর স্বামীর দায়িত্ব হবে নিজ গৃহে রেখে স্ত্রীকে প্রয়োজনীয় ইলম শিখানোর ব্যবস্থা করা। শরয়ী জরুরত ও তবয়ী জরুরত ছাড়া সাবালিকা মহিলার জন্য ঘর হতে বের হওয়ার অনুমতি নেই। বিধায় যেকোনো অনুষ্ঠানে স্বামীর সম্মতি নিয়েও মেয়েদের জন্য যাওয়ার অনুমতি নেই। স্বামীর অনুমতি ছাড়া স্ত্রীকে মা-বাবার জন্য কোথাও নিয়ে যাওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না। (সহীহ বুখারী ১/৪৫৯, সহীহ মুসলিম ১/৪৬৪)

আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে সুস্থ ও সুন্দর সমাজ বিনির্মাণে এগিয়ে যাবে আল-আবরার

নিউ রূপসী কার্পেট

সকল ধরনের কার্পেট বিক্রয় ও
সরবরাহের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

স্বত্বাধিকারী : হাজী সাইদুল কবীর

৭৩/এ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা।
ফোন : ৮৬২৮৮৩৪, ৯৬৭২৩২১

বি.দ্র. মসজিদ মাদরাসার ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ থাকবে

ইসলামে মানবাধিকার-১

মাওলানা রিজওয়ান রফীক জমীরাবাদী

ইসলাম মানবজাতিকে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ বলে ঘোষাণা দিয়েছে। নিরঙ্কুশভাবে এই ঘোষণার পাশাপাশি ইসলাম মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় সর্বোত্তম পন্থাও বাতলিয়ে দিয়েছে। শুধু তা-ই নয়, রাষ্ট্র ও সমাজে মানবাধিকারের সর্বোত্তম বাস্তবায়নও দেখিয়েছে। যার নমুনা মানব ইতিহাসে বিরল। ইসলাম যখন যেখানে যত বেশি সম্প্রসারিত হয়েছে এবং ইসলামী বিধানাবলি যত বেশি চর্চিত ও পালিত হয়েছে, সেখানে তত বেশি মানবাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর বাইরে মানুষের অধিকারের যথাযথ মূল্যায়ন, মানুষের সর্বোচ্চ মর্যাদা ও সম্মান প্রতিষ্ঠা এবং পাশবিকতামুক্ত করে মানবীয় বৈশিষ্ট্যগুণে উদ্ভাসিত করার নমুনা আর পাওয়া যায় না।

আজ মানবাধিকারের কথা বললে মানুষের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় পাশ্চিমা বিশ্বের দিকে। মনে করা হয় তারাই মানবাধিকারের প্রতিষ্ঠাতা। তাদের পক্ষ থেকেও একই দাবি। অথচ তাদের মানবাধিকারের স্লোগানটাই শুরু হয় সতের-আঠার শতাব্দীতে। দীর্ঘদিন অবধি তাদের শাসক আর প্রজাদের মধ্যে চলে আসা বিরোধ একসময় বিস্ফোরিত হয়। তখন থেকে আরম্ভ হয় মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। এর মধ্যদিয়ে সতের ও আঠার শতাব্দীতে তাদের ঘরানায় মানবাধিকার বাস্তবায়নের কথা উঠে আসে। যেমন লন্ডন ১২১৫ সালে মেগনা কার্টা (Magna Corta) প্রতিষ্ঠার পর ১৬২৮ মানবাধিকার পিটিশন (Petition of Rights) (Francis D. Wormuth, The Organs of Modern Constitutionalism, Harper & Brothers Pb., NY, 1949. P. 99 এবং ১৬৮৯ সালে অধিকার বিল (Bill of Rights) অর্জন করে। (The Hutc hinson Encyc lopedia, Helicon Publishing Ltd. , 42, Hythe Bridge Street, Oxford, 1998, p.125) ফ্রান্সের লোকেরা ফ্রান্স আন্দোলনের ওপর ভর করে (১৭৮৯) অধিকারনীতির মাধ্যমে নাগরিক স্বাধীনতা ও অধিকার প্রাপ্ত হন। (The Hutc hinson Encyc l opedia, Helicon Publishing Ltd., 42 Hythe Bridge Street, Oxford, 1998, p.412,914) আমেরিকা ১৭৭৬ সালে স্বাধীনতাযুদ্ধের ঘোষণার মাধ্যমে স্বাধীনতা প্রাপ্ত হয়। (The Hutc hinson Encyc l opedia, Helicon Publishing Ltd., 42, Hythe Bridge Street, Oxford, 1998, p. 300, 1094) ১৭৯১ সালে তারা বিল অব রাইটস (Bill of Rights)-এর মাধ্যমে মৌলিক অধিকার অর্জন করে, যা আমেরিকার আইনে প্রথম দশ সংশোধনীর মূল ছিল। (A. Reader's Digest Library of Modern Knowledge, Vol- 2, 25 Berkeley Square, London, 1979, P- 667, B. The Hutchinson Encyclopedia Helicon Publishing Ltd., 42, Hythe Bridge Street, Oxford, 1998, p. 124, 1094)

এরপর জাতিসংঘের চেষ্টা-প্রচেষ্টা বিশেষত বিভিন্ন কনভেনশন এবং বিভিন্ন সুপারিশের মাধ্যমে আধুনিক রাষ্ট্রসমূহে মানবাধিকারকে তাদের আইনে সংযোজন করে। যার বাস্তবতা আরম্ভ হয় ১৯৪৫ সালে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। (A. Reader's Digest Library of Modern Knowledge, Vol- 2, 25, Berkeley Square, London, 1979, P- 680, 681, B. World Conference on Human Rights, The Vienna Declaration, June 1993, UNO, NY, 1995.)

এই হলো আধুনিক মানবাধিকারের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। তা থেকে বোঝা যায় অন্তত বারো-তেরো শতাব্দী অবধি তাদের নাগরিকগণ মানবাধিকার সম্পর্কে অবহিতই ছিলেন না। না শাসকদের মাঝে সেরূপ চিন্তাচেতনা লক্ষ করা যায়।

অথচ ইসলাম তারও হাজার বছর আগে মানবাধিকারের এমন রূপরেখা বাস্তবায়ন করে গেছে, প্রচলিত সেক্যুলার মানবাধিকার দীর্ঘ আধুনিকায়নের পরও যার সামনে অসহায়।

তবে ইসলামের সঠিক ও সফল মানবাধিকার নীতি সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে অনেক মুসলমানও আজ ইসলাম সম্পর্কে বিরূপ ধারণা পোষণ করে বলে আঁচ করা যায়। সেক্যুলার ঘরানায় লালিত হয়ে অনেকে রীতিমতো ইসলাম সম্পর্কে বিষোদগারও করে থাকেন। এসব অজ্ঞতা, ষড়যন্ত্র ও স্বার্থান্ধতা ছাড়া কিছু নয়।

আমরা এই নিবন্ধে কুরআন-হাদীসের আলোকে ইসলামের মানবাধিকার সম্পর্কে সবিস্তার আলোচনা করার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

ইসলামে হক বা অধিকারকে তিন ভাবে ভাগ করা যায় : ১। মানুষের কাছে আল্লাহর তথা সৃষ্টি কর্তার হক বা প্রাপ্য। উল্লেখ্য, এই হকের উদ্দেশ্য আল্লাহকে কিছু দেওয়া বা তার উপকার করা নয় বরং স্বয়ং মানবজাতির সফলতা ও কামিয়াবীর জন্যই এই হক পূরণ করা। কারণ আল্লাহ কোনোভাবে কোনো বস্তুর মুখাপেক্ষী নন। সে হিসেবে এটিও মানবাধিকারের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। ২। মানুষের পরস্পরের অধিকার। ৩। মানুষের স্বকীয় অধিকার।

মানুষের অধিকার প্রথমে দুই প্রকার : ১। ব্যক্তিগত ২। সামষ্টিক।

ব্যক্তিগত অধিকারের মধ্যে আছে-

১। নিরাপত্তা ২. শিক্ষা-দীক্ষা ৩. অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান ও স্বাধীন চলাফেরা। ৪. সামষ্টিক বিষয়ে যথাযথ অংশগ্রহণ। ৫. ধর্মীয় স্বাধীনতা। ধন-সম্পদ এবং এর

নিরাপত্তা। ৬. চিকিৎসা। ৭. পারস্পরিক সহযোগিতা। ৮. চুক্তি-সমঝোতা। ৯. দাম্পত্য জীবন। ১০. বংশ বিস্তার। ১১. মৃতের প্রাপ্য।

সামষ্টিকভাবে মানুষের অধিকারের মধ্যে আছে–

১। মানবাধিকার এবং সমাজ।

সামাজিকভাবে মানবাধিকারের বাস্তবায়নে যেসব বিষয় লক্ষণীয় তার মধ্যে আছে–

ক. মানুষের মর্যাদা। খ. সাম্য। গ. স্বাধীনতা। ঘ. ভ্রাতিত্ব। ঙ. ন্যায়বিচার. চ. উদারতা।

২। অর্থনৈতিক অধিকার।

৩। ধর্মীয় অধিকার।

৪। রাজনৈতিক অধিকার।

৫। আইনি অধিকার।

৬। রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তাবিষয়ক অধিকার ইত্যাদি।

এরূপ মানুষের যাবতীয় অধিকারের ব্যাপারে ইসলামের সুস্পষ্ট ও বাস্তবসম্মত দিকনির্দেশনা এবং সফল আদর্শ রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মানুষের যাবতীয় অধিকারসমূহ কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে এবং তা প্রতিষ্ঠিত হলে পার্থিবসহ যাবতীয় জীবনে মানুষ কিভাবে সফলকাম হয়ে শান্তির সর্বোচ্চ শিখর চূড়া স্পর্শ করতে পারবে তার বাস্তব শিক্ষা দিয়ে গেছেন। আবার তাঁর বাতলানো এই পথ পরিত্যাগ করে অন্য পথের যাত্রী হলে দুনিয়া ও আখেরাতে কিরূপ দুর্ভোগ পোহাতে হবে, তাও বলে গেছেন।

ইসলামে মানুষের মর্যাদা :

ইসলাম মানুষের অধিকার বিবেচনা করে মানুষ দুনিয়ার যাবতীয় সৃষ্টির মধ্যে সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী হিসেবে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে তার যাবতীয় মাখলুকের মধ্যে উত্তম ও মর্যাদার অধিকারী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। এমনকি মানুষ সৃষ্টির পর ফেরেশতাদেরকে তাদের সাজদা করার হুকুম দেওয়া এবং ফেরেশতাগণ কর্তৃক হযরত আদম (আ.)-কে সাজদা করার মাধ্যমে বাস্তবেই মানুষের মর্যাদার স্বীকৃতি দিয়েছেন আল্লাহ তা'আলা। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন –

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

"নিশ্চয় আমি আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি, আমি তাদেরকে স্থলে ও জলে চলাচলের বাহন দান করেছি, তাদেরকে উত্তম জীবনোপকরণ প্রদান করেছি এবং তাদেরকে সৃষ্ট বস্তুর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি। (বনী ইসরায়ীল ৭০)

আরো ইরশাদ করেন–

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

আমি সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতম অবয়বে। (সূরা তীন ৪)

সৃষ্টিজগৎকে আল্লাহ তা'আলা মানুষের কাজে নিয়োজিত রেখেছেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন–

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

তোমরা কি দেখো না আল্লাহ নভোঃমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই তোমাদের কাজে নিয়েজিত করে দিয়েছেন...। (সূরা লোকমান ২০)

ইসলাম একদিকে মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা দিয়েছে অন্যদিকে তাদের পরস্পর সমঅধিকার ও সাম্যের প্রতি সমধিক গুরুত্ব দিয়েছে। এ কারণে ইসলামে সাম্যের গুরুত্ব অনেক বেশি। অন্য যেকোনো আদর্শ এরূপ সমতা ও সাম্য প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে–

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় করো, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তার থেকে তার সঙ্গীনীকে সৃষ্টি করেছেন, আর বিস্তার করেছেন তাদের দুজন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী। আর আল্লাহকে ভয় করো, যাঁর নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাঞ্চা করে থাকো এবং আত্মীয় জ্ঞাতিদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করো। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে সচেতন রয়েছেন। (সূরা নিসা ১)

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে–

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

হে মানব! আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পর পরিচিত হও। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সব কিছুর খবর রাখেন। (সূরা হুজরাত ১৩)

বিদায় হজ্বের খোৎবায় রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন–

يا ايهاالناس الا ان ربكم واحد وان اباء كم واحد الا لا فضل لعربى على عجمى ولا لعجمى على عربى ولا لاحمر على اسود ولا لاسود على احمر الا بالتقوى۔

"হে লোক সকল! সাবধান! তোমাদের পালনকর্তা এক, তোমাদের পিতাও এক (হযরত আদম আ.) কোনো আরব

অনারবের ওপর কোনো অনারব আরবের ওপর মর্যাদাশীল নয়, না কোনো কালো আর গোরার মধ্যে তারতম্য আছে। তবে (তারতম্য হলে) তাকওয়া (এর ভিত্তিতে হতে পারে)। (মুসনাদে আহমদ ৫/৪১১ হা. ২৩৫৩৬)

নবী (সা.) আরো ইরশাদ করেন–

الناس كلهم بنو آدم وآدم خلق من تراب

"সকল লোক আদম (আ.)-এর সন্তান এবং আদম (আ.) মাটি দ্বারা সৃষ্ট।" (...)

পবিত্র কুরআন ও হাদীসের এসব শাশ্বত বাণীর মাধ্যমে দুনিয়াতে মানুষ পেয়েছে সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদা এবং এর মাধ্যমে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়েছে জাতি, বংশ, বর্ণ সর্বপ্রকারের ভেদাভেদ।

যেহেতু ইসলাম মানুষের দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানের সফলতার গ্যারান্টি দেয় সে কারণে ইসলামের বর্ণিত অধিকার ও হককে তিন ভাগে ভাগ করা যায় যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে : তার মধ্যে এক নাম্বার হলো, সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর হক মানুষের ওপর।

এক. মানুষের ওপর আল্লাহর হক।

হাদীস শরীফে এসেছে–

عن معاذ بن جبلؓ قال قال رسول الله ﷺ يا معاذ اتدرى ماحق الله على العباد قال الله ورسوله اعلم قال ان يعبد الله ولا يشرك به شيئا قال اتدرى ماحقهم عليه اذا فعلوا ذالك فقال الله ورسوله اعلم قال ان لا يعذبهم

হযরত মু'আয (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, হে মু'আয! বান্দার কাছে আল্লাহর কী হক জানো? হযরত মু'আয বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.) ভালো জানেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, নিশ্চয়ই বান্দার কাছে আল্লাহর হক হলো তাঁরই ইবাদত করা এবং তাঁর সাথে কাউকেও অংশীদার না করা। রাসূল (সা.) আবার বললেন, হে মু'আয! তুমি কি জানো আল্লাহর কাছে বান্দার প্রাপ্য কী? তিনি বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.) ভালো জানেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, আল্লাহর কাছে বান্দার প্রাপ্য হলো (এরূপ) বান্দাদেরকে আযাব না দেওয়া।" (বুখারী হা. ২৭০১, মুসলিম ১/৫৯ হা. ৩০)

হকের ব্যাখ্যায় আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন –

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

আর ইবাদত করো আল্লাহর, শরীক করো না তাঁর সাথে অপর কাউকে। পিতা-মাতার সাথে সৎ ও সদয় ব্যবহার করো এবং নিকটাত্মীয়, এতীম-মিসকীন, প্রতিবেশী, অসহায় মুসাফির এবং নিজের দাসদাসীর প্রতিও। নিশ্চয় আল্লাহ পছন্দ করেন না দাম্ভিক-গর্বিতজনকে। (সূরা নিসা ৩৬)

আরেক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

এটিকে বলা হয় হুকুকুল্লাহ। অর্থাৎ বান্দার কাছ থেকে আল্লাহর প্রাপ্য। এই হক আদাই করা মানুষের অবশ্য করণীয়। কারণ এটি মূলত মানুষের মুক্তি ও সফলতার জন্যই পালনীয়। এমন নয় যে, এর দ্বারা সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর কোনো উপকার করা হবে। কারণ আল্লাহ তা'আলা কারো মুখাপেক্ষী নন। মুখাপেক্ষিতার সম্পূর্ণ উর্ধ্বে। সুতরাং আল্লাহর নির্দেশিত এ সকল আল্লাহর হক হলো স্বয়ং পালনকারীর জন্যই, তারই উপকারার্থে। বিবেচনা করতে গেলে এটি মানুষের সবচেয়ে বড় অধিকার। মানুষকে দুনিয়া আখেরাতে উভয় জাহানে সফল হওয়ার অধিকার দিতে হবে। যারা মানুষকে তা থেকে বঞ্চিত করার জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে চেষ্টা করে বা যেকোনোভাবে তা থেকে বিমুখ করার প্রয়াস চালায় তারা এ ক্ষেত্রে মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী হিসেবে সাব্যস্ত হবে।

মনে রাখতে হবে, এটি সারা দুনিয়ার সকল মানুষের অধিকার। দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানের সফলতা খুঁজে পাওয়া। প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তার পরিচয় পেতে পারা এবং তাঁর নির্দেশিত পথে চালিত হয়ে মুক্তি ও সফলতা অর্জন করতে পারা।

এটিই মানুষের মৌলিক অধিকার। মানবাধিকারের কথা যেখানে আসবে সেখানে এই মৌলিক অধিকারটিই সর্বপ্রথম বিবেচ্য হওয়া আবশ্যক। কারণ দুনিয়ার সব অধিকার ব্যাখ্যা করলাম, সব অধিকার কড়ায়-গণ্ডায় আদায় করলাম কিন্তু মুক্তি-সফলতা এবং কামিয়াবীর ধারে কাছেও গেলাম না তাহলে মনে করতে হবে কোনো অধিকারই আমার অর্জিত হয়নি। সুতরাং যে সকল মানবাধিকারের ব্যাখ্যায় মানুষের মৌলিক সফলতার বিষয়টি বিবর্জিত-উপেক্ষিত তা পরিপূর্ণ মানবাধিকারের ব্যাখ্যা হতে পারে না। আপাত দৃষ্টিতে ধর্মের ব্যাখ্যা এক পাশে রাখলাম, এরপর আমাকে এমন মানবাধিকারের সন্ধান দিন, যেখানে মানবজাতির জাগতিক, অধ্যাত্মিক সর্বক্ষেত্রে সফলতা অর্জনের অধিকারের ব্যাখ্যা আছে। নিশ্চয়ই পারা যাবে না। আবার তাতে এমন একটি পয়েন্ট জুড়ে দিলেও হবে না যে, সবার ধর্মীয় স্বাধীনতা আছে। কারণ যাদেরকেই মানবাধিকার নীতি প্রণয়নের যোগ্য বলে মনে করা হবে, বা দাবি করা হবে তাদেরকে মানুষের মৌলিক সফলতার সঠিক এবং বাস্তব পথ কোনটি তার জ্ঞানও থাকতে হবে। সেটা ধর্ম হোক, দুনিয়ার যেকোনো রীতিনীতি হোক। সে

ব্যাখ্যা যারা দিতে পারবে না, সঠিক এবং বাস্তব পথ সম্পর্কে যাদের আদৌ জ্ঞান থাকবে না তাদের মানবাধিকার ব্যাখ্যা কখনও কোনো সময় পরিপূর্ণ হবে না।

ইসলামের প্রারম্ভই এর ওপর যে, আল্লাহ তা'আলা তথা সৃষ্টিকর্তা-পালনকর্তার হক আদায় করা। এর মধ্যে আছে–আল্লাহর ওপর ঈমান আনা, তাঁর আদেশ ও নিষেধ মতো জীবন পরিচালনা করা।

এর পরে আসে মানুষের মৌলিক অন্যান্য অধিকারসমূহ। তার মধ্যে সর্বপ্রথম ব্যক্তিগত। মানুষের ব্যক্তিগত অধিকার সম্পর্কে ইসলামের ব্যাখ্যা শাশ্বত। হালজামানা নয়, দুনিয়া যত দিন টিকে থাকবে তত দিন সকল মানুষ এই নীতি থেকে যথাযথভাবে সফলভাবে উপকৃত হতে পারবে। এরূপ সর্বজনীন ও শাশ্বত আর কোনো ব্যাখ্যা হতে পারে না। ইসলামপ্রদত্ত মানুষের ব্যক্তিগত অধিকারকে বিভিন্ন দিক দিয়ে ভাগ করা যায়।

১। মানুষের জীবনের নিরাপত্তা :

মানুষের জীবন আল্লাহপ্রদত্ত এবং মানুষ আল্লাহর ভাষায় সর্বোত্তম সৃষ্টি। সে হিসেবে মানুষের জীবন আল্লাহর কাছে সব কিছু থেকে মর্যাদার অধিকারী। তাই আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন –

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

যে কেউ প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ বা পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করা ছাড়া কাউকে হত্যা করে সে যেন সব মানুষকেই হত্যা করে। এবং যে কারও জীবন রক্ষা করে সে যেন সবার জীবন রক্ষা করে। (মায়েদা ৩২)

আরেক আয়াতে আছে–

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ .... وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

তোমরা স্বীয় সন্তানদের দারিদ্র্যের কারণে হত্যা করো না–আমি তোমাদেরকে ও তাদেরকে আহার দিই। .....যাকে হত্যা করা আল্লাহ হারাম করেছেন তাকে হত্যা করো না, কিন্তু ন্যায়ভাবে। তোমাদেরকে এই নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তোমরা বোঝ। (সূরা আনআম ১৫১

এরূপ আরো বহু আয়াতে মানুষের জান ও প্রাণের অধিকারের ব্যাপারে সচেতন থাকার জন্য কঠোরভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং কোনো মানুষকে অন্যায়ভাবে হত্যা করাকে হারাম করে দেওয়া হয়েছে। যার মাধ্যমে মানুষ হত্যার পথ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয় নিজের প্রাণকে নিজে হত্যা করার অধিকারও দেওয়া হয়নি।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন–

من تردى من جبل فقتل نفسه فهو فى نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها ابدا ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه فى يده يتحساه فى نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته فى يده يجأ بها فى بطنه فى نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا۔

যে নিজেকে পাহাড় থেকে নিক্ষেপ করে আত্মহত্যা করে তার স্থান হবে জাহান্নাম, সমসময় সেখানে নিক্ষিপ্ত হতেই থাকবে, যে লোক বিষ পানে আত্মাহুতি দেয় জাহান্নামে তার হাতে বিষ থাকবে সে তা সব সময় পান করতে থাকবে, যে লোক লোহার অস্ত্রের মাধ্যমে আত্মাহুতি দেয় জাহান্নামে তার হাতে সেরূপ অস্ত্র থাকবে আগুনে সে সব সময় নিজের পেটে তা মারতে থাকবে এবং অনন্তকাল সে সেখানে থাকবে।" (বুখারী হা. ৫৪৪২, মুসলিম ১/১০৩ হা. ১০৯, তিরমিযী ৪/৩৮৬ হা. ২০৪৩ ইত্যাদি)

আরেক হাদীসে আছে–

হযরত সাবেত ইবনে জাহ্হাক বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন–

ـومن قتل نفسه بشئ فى الدنيا عذب به يوم القيامة

যে লোক দুনিয়াতে কোনো কিছু দ্বারা আত্মাহুতি দেয় তবে জাহান্নামে তাকে সেরূপ বস্তু দ্বারাই আযাব দেওয়া হবে।

হাদীসের এ সকল স্পষ্ট বাণীর মাধ্যমে মানুষের জন্য আত্মাহুতি দেওয়াও হারাম করা হয়েছে।

মোট কথা, ইসলাম মানুষের প্রাণের কিরূপ মর্যাদা দিয়ে থাকে তা কুরআন-হাদীসের অসংখ্য স্পষ্ট বাণী থেকে প্রতীয়মান হয়। একদিকে ইসলাম সব ধরনের মানুষ হত্যাকে হারাম করে কঠোরভাবে হুঁশিয়ারি করেছে। অন্যদিকে ইসলাম মানুষকে সর্বোত্তম মর্যাদা দিয়ে থাকে বলেই মানুষ হত্যার বদলে কেসাস তথা হত্যারও হুকুম দিয়েছে। তার কারণ হলো এমন মর্যাদাশীল মানুষ হত্যার যদি যথাযথ বিচার না হয় তবে মানুষের প্রাণের এমন মর্যাদা আর বাকি থাকবে না। সমাজের কয়েকজন দুষ্কৃতকারীর হাতে সকল মানুষ জিম্মি হয়ে থাকবে। মানুষ তাদের মানবতার চর্চা করতে পাবে না। বরং মানুষকে বিচরণ করতে হবে অনিশ্চয়তার এক আঁধার মরুভূমিতে। যেখানে জানের নিরাপত্তা থাকবে না মালের নিরাপত্তা থাকবে না। মানুষ হত্যার মতো অপরাধ, যার দ্বারা সংঘটিত হবে তার দ্বারা সেরূপ ঘটনা আরো সংঘটিত হওয়ার ব্যাপক আশঙ্কা থেকে যায়। সে কারণে ইসলাম পুরো জাতিকে রক্ষার জন্য অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যাকারীর সাজা প্রণয়ন করেছে হত্যা। এর চাইতে যুক্তিসংগত এবং আধুনিক বিচার আর হতে পারে না। এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা পরে করা হবে ইনশাআল্লাহ।

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

AL MARWAH OVERSEAS
recruting agent licence no-rl156

ROYAL AIR SERVICE SYSTEM
hajj, umrah, IATA approved travel agent

হজ, ওমরাসহ বিশ্বের সকল দেশের ভিসা প্রসেসিং ও সকল এয়ারলাইন্স টিকেটিং অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে অল্পখরচে দ্রুত সম্পন্ন করা হয়।

Shama Complex (6th Floor)
66/A Naya Paltan, V.I.P Road
(Opposite of Paltan Thana East Side of City Haeart Market)
Dhaka: 1000, Bangladesh.
Phone: 9361777, 9333654, 8350814
Fax 88-02-9338465
Cell: 01711-520547
E-mail: rass@dhaka.net

আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে সর্বপ্রকার বাতিলের মোকাবেলায় এগিয়ে যাবে
"আল-আবরার" এই কামনায়

জনপ্রিয় ১৯৩৭ সাবান

প্রস্তুতকারক

হাজী নুরআলী সওদাগর এন্ড সন্স লিঃ
চাক্তাই, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।
ফোন : বিক্রয় কেন্দ্র : -০৩১-৬৩৪৯০৫, অফিস: ০৩১-৬৩২৪৯৩, ৬৩৪৭৮৩